

অভীক দত্ত

দ্য রেড বুক

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা

প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০২০
প্রচ্ছদ- তৌসিফ হক

SWIFT BOOX iWRITE
https ://iwrite.app

মাকে...

সূচিপত্র

২০।

২১।

২২।

২৩।

২৪।

২৫।

২৬।

২৭।

২৮।

২৯।

৩০।

৩১।

৩২।

৩৩।

১।

ভোটের রেজাল্ট প্রকাশ পেয়েছে।
বাড়ির বাইরে প্রবল আবীর খেলা চলছে। প্রাচীরের ভিতরে বাইরে থেকে চকলেট বোমও ফেলা হয়েছে।
তপন রায়ের বাড়িতে আজ আর কেউ নেই।
অন্যান্য দিন লোক গিজগিজ করে।
আজ বাড়ি ফাঁকা। তপনের স্ত্রী শ্যামলী এসে বললেন, “বাইরের গেটে ওরা ভিড় করেছে”।
তপন বললেন, “দরজা খুলে দাও”।
শ্যামলী ভয়ের গলায় বললেন, “যদি অসভ্যতা করে?”
তপন বললেন, “করবে না। আর যদি করেও, কিছু করার নেই। দরজা খুলে দাও”।
শ্যামলী কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে বাইরে গিয়ে দরজা খুললেন।
একগাদা ছেলে ঘরের ভিতর ঢুকল। তাদের মুখ জ্যান্তব উল্লাস।
তপন বললেন, “বল”।
ভজা বেশ উদ্ধত গলায় বলল, “আমরা জিতেছি কাকু। আবীর মাখাতে এলাম”।
তপন বললেন, “মাখাও”।
ছেলেগুলো এসে বাজে ভাবে তপনের মুখে আবীর মাখিয়ে দিল।
তপন চুপ করে বসে রইলেন।
আবীর দেওয়া হয়ে গেলে ভজা বলল, “আপনি আমাদের দলে চলে আসুন। এ পাড়ায় আপনারা শূন্য। কী হবে আর এ দল করে?”
তপন বললেন, “সংসদীয় গণতন্ত্রে একজন হলেও বিরোধী থাকতে হয় ভজা। আমরা এটাই নিয়ম। যাই হোক, তোমরা আনন্দ কর”।
ভজা বলল, “সে তো করবই। এবার এ আমলে চাকরি করব, আমাদের সময় এখন”।
তপন বললেন, “বেশ তো। এই আমলে চাকরি পাবে। এই জন্যই তো আমরা হেরে গেলাম। ভাল হোক তোমাদের”।
ভজা তপনের দিকে বিষ দৃষ্টিতে কয়েকবার তাকিয়ে বাকি সবাইকে বলল, “এই চল চল”।
সবাই হুল্লোড় করে বেরিয়ে গেল।
যাওয়ার সময় ওরা শ্যামলীর যত্ন করে লাগানো গাছগুলো মাড়িয়ে দিয়ে গেল।
গেটের কাছেই বোম মেরে নাচতে শুরু করল।
তপন কিছু বললেন না। শ্যামলী বললেন, “আমাদের পার্টির ছেলেরা কি আসবে না কেউ আর?”
তপন বললেন, “আজ থেকে আর কেউ আসবে না ধরে নাও”।
শ্যামলী বললেন, “চা করে দেব?”
তপন বললেন, “থাক। আমি একটু একা থাকি। কেউ এলে বলে দিও বাড়িতে নেই”।
শ্যামলী বেরিয়ে গেলেন।
তাদের ঠিক বাড়ির বাইরে মাইক লাগানো হয়েছে।
খুব বেশি ভলিউমে রবীন্দ্রসঙ্গীত চালানো হয়েছে...

২।

“সকালের খবর” কাগজের চিফ এডিটর মিটিং ডেকেছেন।
সোনালীর ঢুকতে দেরী হয়েছিল। দেখল দিলীপ সান্যাল গম্ভীর মুখে তার দিকে একবার তাকিয়ে বাকিদের বলল, “চৌত্রিশ বছর। অনেকটা লম্বা সময়। এর অবসান যখন হয়েছে, আমাদেরও কিছু কাজ থেকে যায়, তাই না? একটা বড় লাশ পাওয়া গেছে, সেটার পোস্টমর্টেম করতে হবে তো?”
সিনিয়র রিপোর্টার কাবেরী বললেন, “কী করতে হবে আমাদের?”
দিলীপ বললেন, “রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হতে হবে আর কী! কবর খুঁড়তে হবে। সে যুগ কত খারাপ ছিল, কোন নেতা, কত টাকা করেছে, কীভাবে করেছে। পার্টি অফিসগুলো কীভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কৌটো নাড়িয়ে ওঠা টাকা কোথায় গেছে, ঋষিতুল্য মানুষের আড়ালে কোন কোন মানুষ কী কী করেছে, বউ থাকা সত্বেও কীভাবে পার্টির মেয়েদের সঙ্গে শুয়েছে... উই নিড টু ব্রিং এভ্রি সিঙ্গল ব্ল্যাক স্পট। ফিল্ড ওয়ার্কের কোর টিম থাকবে পাঁচ জনের। সোনালী, বিদেশ, সৌপর্ণ, সমীর আর রাখির। তোমরা রিপোর্ট করবে কাবেরীকে। কাবেরী আমার সঙ্গে বসে এই রিপোর্টগুলো ফাইনাল করবে। নেক্সট উইক থেকে প্রতিদিন এই কলাম বেরোবে ফ্রন্ট পেজে। নিজেরা ঠিক করে ফেলো কোথায় কে যাবে। সল্টলেকের সেই নেতা, প্রত্যুষ সাঁতরা, যার ছেলের পেট্রোল পাম্প আছে, তার খবর দিয়ে শুরু করব। এই খবরটা হাতে আছে। নিজের ছেলেকে পেট্রোল পাম্প করে দিয়েছে। আর একটা কে আছে যেন? ওহ, হ্যাঁ, দশ হাজারি চশমার মালিক। তেনার খবর করবে সমীর। সোনালীকে আমি আজকে দেরী করে আসার শাস্তি দেব”।
সোনালী সভয়ে দিলীপের দিকে তাকাল।
দিলীপ বললেন, “তোমাকে আমি কঠিন কাজ দিলাম। কাজটা খবর বের করার। তপন রায়ের বাড়ি যাবে। তপন রায় খুব সৎ সেজে ঘোরে। তোমার কাজ হল ওর কেচ্ছা বের করা। দিন পনেরো সময় থাকল। এছাড়াও আর কোন নেতার ছোট খাটো খবর যা পাবে, সব কাবেরীকে দিতে থাকবে। কার বাড়ি বড় হয়েছে, কার সম্পত্তি কতটা বেড়েছে, এগুলোর জন্য তোমাদের চোখ কান খোলা রাখতে হবে। এই কাজের রিপোর্ট ভাল হলে অবশ্যই ইনসেন্টিভ থাকবে। ক্লিয়ার করতে পেরেছি?”
কাবেরী বললেন, “আপনি বলছেন সময় কম, এদিকে সোনালীকে পনেরো দিন সময় দিচ্ছেন। এটা কেন?”
দিলীপ বললেন, “যে বাদাম ভাঙতে শক্ত, সে বাদাম ভাঙার জন্য সময় তো দিতে হবে। তার দুর্বলতা বা ক্ষোভ না পাওয়া গেলে কী করে আমরা সে কাজটা করব? পেপারটা চালাতে হবে তো নাকি? বিজ্ঞাপন কে দেবে এই মাগ্যি গন্ডার বাজারে?”
কাবেরী বললেন, “ঠিক আছে স্যার, আমরা যতটা পারি আপনাকে আজকে একটা স্ট্রাকচার বানিয়ে দেখাচ্ছি। বাকিটা আপনি ঠিক করবেন কী করা যায়”।
দিলীপ বললেন, “কী করা যায় মানে? বাড়ির ছবি দিয়ে ফ্রন্ট পেজ হেডলাইন কর। নন্দীগ্রামে ওদের যে নেতা বড় বাড়ি করেছে, এখন ঘর ছাড়া, সে ছবিটা আছে তো? ফার্স্ট নিউজ সেটাই কর। গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমাদের কাজ শুধু খোঁজা আর খবর করা”।
কাবেরী বললেন, “খবর করতে গিয়ে যদি দেখা যায় সে নেতারা দল পাল্টে ফেলেছে?”
দিলীপ বললেন, “সে ক্ষেত্রে তাদের খবর চেপে দিতে হবে। এক কাজ করবে, প্রতিটা রিপোর্টের নিচে একটা রিমার্কস কলাম করবে। ওখানে লিখে দেবে এই নেতার দল বদলানোর চান্স কতখানি। বুঝেছো তো সোনালী?”

সোনালী বলল, "বুঝেছি"।
দিলীপ বললেন, "এখন একটা পালাবদল ঘটেছে। সেটা ভাল না খারাপ, তার বিচার পরে হবে। আপাতত আমাদের কাজ হবে যতটা ব্ল্যাক স্পট আছে, সেগুলোকে প্রকাশ্যে আনা। কাজটা এমন কিছু কঠিন না। সোজাই। কিন্তু এই কাজটা আমাদের অনেকখানি মাইলেজ এনে দেবে। বিক্রিটাও বাড়বে। রাইট?"
দিলীপ কাবেরীর দিকে তাকালেন।
কাবেরী বললেন, "রাইট"।
দিলীপ বললেন, "মিটিং ওভার"।
তারা ঘর থেকে বেরোল।
কাবেরী চেম্বারের দিকে যাচ্ছিল। সোনালী কাবেরীর পিছন পিছন গিয়ে বলল, "ও কাবেরীদি, তপন রায়কে তো আমি চিনিই না"।
কাবেরী বললেন, "বাড়ি চলে যা। আমি ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছে। ডিরেকশনও দিয়ে দিচ্ছি"।
সোনালী ইতস্তত করে বলল, "কোন রিস্ক নেই তো?"
কাবেরী বললেন, "কোন কাজে রিস্ক নেই? তাহলে এই লাইনে এলি কেন? রাজাকে নিয়ে যা। ক্যামেরা ম্যানের কাজও হবে। প্রেমও হবে"।
সোনালী লজ্জা পেয়ে বলল, "ধুস, কী যে বল। প্রেম করতে যাব কেন?"
কাবেরী বললেন, "সে কী, তুই প্রেম করিস না রাজার সঙ্গে?"
সোনালী বলল, "এসব কে রটায়?"
কাবেরী বললেন, "যাহ্‌। আমি তো ভাবতাম প্রেম করিস বোধ হয়। সারাক্ষণ গুজগুজ করে যাচ্ছিস"।
সোনালী বলল, "তুমি একটা জঘন্য। কেন প্রেম করতে যাব? উই আর গুড ফ্রেন্ডস"।
কাবেরী বললেন, "বুঝেছি। তুই সেলিব্রিটি সুলভ ভাব মারছিস। গুড ফ্রেন্ডস মানেই ইয়ে আর কী। যাক গে, তপনদাকে আমি বলে রাখব। ওর বাড়িতে এন্ট্রি পেতে অসুবিধে হবে না। লোক ভাল। দিলীপদা যাই বলুন, তপন রায়ের লুপ হোলস পাওয়া চাপ আছে ভাই। বরং কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে যা যা জানতে চাস, জেনে নে। ফিউচারে কাজে দেবে"।
সোনালী থমকে গিয়ে বলল, "তুমি এ কথা বলছ?"
কাবেরী সোনালীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "রিপোর্টার হতে হলে নিরপেক্ষ হতে হয়। এডিটোরিয়াল পলিসি যাই হোক। আগেও বলেছি, আরেকবার বলে রাখলাম। মাথায় রাখিস"।

৩।

রাস্তায় রাস্তায় আবীর খেলা হয়েছে। উৎসবের ছাপ সর্বত্র।
দুপুর বারোটা নাগাদ তারা বাজারের কাছে পৌঁছল। অটো থেকে নেমে এক দোকানে তপনের বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে হল। সে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে রাজা বলল, "এর থেকে বিয়েবাড়িতে ফটোগ্রাফি করা ভাল বুঝলি? কারো আমাদের রিপোর্টিং পছন্দ না হলে সবাই আগে আমার ক্যামেরাটা টার্গেট করে। কত কষ্ট করে এসব কিনি কেউ বুঝবে?"
সোনালী মনে মনে তপনকে কী প্রশ্ন করবে ঠিক করছিল। রাজার কথার উত্তরে অন্যমনস্ক গলায় বলল, "হু"।
রাজা বলল, "কী হু? তোর কী হয়? ঘুমাতে ঘুমাতে হাঁটছিস নাকি?"
সোনালী বলল, "ওই হল। থাম এবার। এসে গেছি বোধ হয়"।
পাঁচিল ঘেরা একটা লাল রঙের দেড় তলা বাড়ি। বাইরের বাগানটা যেন কেউ দুমড়ে দিয়ে গেছে। রাজা বাইরের গেট খুলল।
বাগান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাজা বলল, "জনরোষ। দেখেছিস বাগানটার হাল?"
সোনালী চাপা গলায় ধমক দিল, "তুই থামবি? চুপ কর"।
কলিং বেল টিপল রাজা।
এক ভদ্রমহিলা দরজা খুলে জিজ্ঞাসু মুখে তাকালেন।
সোনালী বলল, "তপনবাবু আছেন? আমরা সকালের খবর থেকে আসছি"।
ভদ্রমহিলা দরজা খুলে বললেন, "আসুন"।
বাইরের ঘরে বসিয়ে ভিতরে গেলেন ভদ্রমহিলা। রাজা বলল "ওর স্ত্রী বোধ হয়"।
সোনালী বলল, "হবে"।
ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরটা দেখছিল সোনালী। একটা শো কেসে একগাদা ছবি। কোনটায় বড় কোন নেতার সঙ্গে, কোন কোনটায় তপনবাবু বক্তৃতা দেওয়ার ছবি। একগাদা সংবর্ধনার মানপত্র। আরেক দেওয়াল শো কেসে একগাদা বই। রবীন্দ্রনাথ থেকে দাস কাপিতাল সব আছে।
"এখন কী ব্যাপার? আপনাদের তো এখন এই বাড়িতে আসার কথা না!"
ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন "তপন"।
সোনালী উঠে দাঁড়াল, "কাবেরীদি বোধ হয় আপনাকে ফোন করেছিলেন"।
তপন বসলেন, "হ্যাঁ। কাবেরী বলেছে। বাম পতনের কারণ নিয়ে স্টোরি করছেন আপনারা"।
কথাটা বলেই তপন হাসলেন। সোনালীও হাসল।
সোনালী বলল, "অ্যাকচুয়ালি স্যার, এই সময়টা আপনারা কী কী করছেন, হারের কারণ বিশ্লেষণ কীভাবে করছেন, সেগুলো নিয়েই স্টোরিটা হবে"।
তপন বললেন, "সে তো বুঝলাম, কিন্তু আপনারা যে কাগজ থেকে এসেছেন, সে কাগজটাই বা ক'দিন টিকবে, সেটা সম্পর্কে কিছু জানেন কি? চিটফান্ডের কোম্পানির টাকায় চলছে, ভুঁইফোড়ের মত একের পর এক চ্যানেল আর খবরের কাগজ খুলে যাচ্ছে, এগুলো আপনাদের স্বাভাবিক মনে হচ্ছে"?
সোনালী আর রাজা একবার চোখাচুখি করে নিল।
সোনালী বলল, "আমি সবে জারনালিজম পাশ করেছি স্যার। এত কিছু আমি জানি না"।

তপন বললেন, "দেখুন খুব বেসিক কয়েকটা কথা আপনাদের বলে নি আগে। সংসদীয় গণতন্ত্রে একটা দল চৌত্রিশ বছর ক্ষমতায় থাকবে, এটাই সব থেকে বেশি অস্বাভাবিক। এটা হবারই ছিল। বরং এতদিন হয়নি সেটাই সব থেকে বেশি খারাপ। সামনের দিনগুলো আরও ভয়াবহ আসবে আমাদের। সেটা আমরা কীভাবে যুঝব, প্রশ্নটা সেখানেই। দ্বিতীয়ত, যে দলটা ক্ষমতায় এসেছে এবং যাদের মাধ্যমে এসেছে, তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা আমার কাছে নেই। আমি বিশ্বাস করি না এই পার্টনারশিপ বেশিদিন চলবে। হয় ছোট ছোট মাছগুলো বড় মাছকে খাবে, নয়ত বড় মাছ ছোটমাছগুলোকে খেয়ে নেবে। আমার মতে দ্বিতীয়টা হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আপনাদের দুজনকে বরং আমি একটা সাজেশনই দেব, চাকরি খুঁজতে শুরু করুন এখন থেকেই। চিটফান্ডের টাকায় যে মিডিয়া চলে, সে মিডিয়া বেশিদিন টিকতে পারে না"।
সোনালী ঠোঁট কামড়াল, পরক্ষণেই মরিয়া হয়ে বলল, "কিন্তু স্যার আপনাদের দলও টিকবে নাকি তার কোন গ্যারান্টি আছে কি? একের পর এক নেতা দল পাল্টাচ্ছেন। এটাকে আপনি কী চোখে দেখছেন?"
তপন হাসলেন, "নেতা হওয়া অত সোজা বলে আপনার মনে হয়? নেতা মানে কী? নেতা সে হয়, যাকে মানুষ নির্বাচিত করে। সে অর্থে ঠিক ঠাক নেতা আমরা কেউ হতে পারি নি। আমিও পারি নি। নইলে যে বাড়িতে চামচা গিজগিজ করত, সে বাড়ি ফাঁকা হয়ে যেত না হারার সঙ্গে সঙ্গে। ক্ষমতার বৃত্তে থাকলে সবাই সঙ্গে থাকে। সেই ক্ষমতার লোভ থেকে মুক্ত হওয়া খুব কঠিন"।
সোনালী বলল, "আর আপনাদের দলের সাবোতাজ? গোষ্ঠীবাজি? সেসব নিয়ে কিছু বলবেন না?"
শ্যামলী চা নিয়ে ঢুকলেন। টেবিলে চায়ের ট্রে রেখে চলে গেলেন। তপন তার কাপটা হাতে নিয়ে বললেন, "দ্বন্দ্ব থাকে সব দলেই। সেটা যখন বাড়তে বাড়তে সব কিছু গিলে ফেলে, তখন কার কী করার থাকে? বিজ্ঞানে আইডিয়াল সিচুয়েশন বলে একটা বস্তু আছে জানেন তো। আদর্শ পরিস্থিতি। সে পরিস্থিতিতে সব কিছু সম্ভব। কিন্তু আদৌ কি আদর্শ পরিস্থিতি অ্যাচিভ করা গেছে? আমাদের দেশে একইভাবে আদর্শ রাজনৈতিক দল বলে কিছু হয় না। কেউ পুঁজির কাছে মাথা নত করে, কেউ মাথা নত করে ক্ষমতার কাছে। নৈতিকতা, তাত্ত্বিকতা খুব কম মানুষ মেনে চলে। আর এই যুগে এসে মানুষ আর সেসব পছন্দও করে না। তারা গিমিক চায়। তারা বলিউডি চটুল সঙ্গীত ভালবাসবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাদের ঘুম পাবে... এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যারা আমার দলের মানুষ, তারাও পরিবর্তিত হবেন, বলাই বাহুল্য"।
সোনালী বলল, "এই নৈতিকতার পতনের পিছনে আপনাদের কোন দায়িত্ব নেই? এত বছর ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও আপনারা কেন এসব আটকাতে পারেন নি? রুচির পতন আটকাতে পারেন নি কেন?
তপন বললেন, "অবশ্যই দায় আছে। সব থেকে বড় দায় বামপন্থীদেরই। অর্ধশিক্ষার প্রসার আমাদের আমলে হয়েছে, এ কথা অস্বীকার করব কী করে? জ্যোতিষের বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে পেরেছি, চিটফান্ডের রমরমা কিংবা পণপ্রথা? কিচ্ছু পারি নি। আবার অনেক কিছু পেরেওছি। আমার মনে হয় না, আমরা কী কী পেরেছি তা নিয়ে আপনাদের কাগজ আগ্রহী বলে"।
হঠাৎ করে পাশ থেকে রাজা বলে বসল, "আপনারা হেরেছেন বলে মানুষ উৎসব করছে। এত এত বড় বড় কথা বলে, এতদিন ক্ষমতায় থাকার পরেও মানুষ আপনাদের উপর এত রেগে ছিল?"
সোনালী রাজার দিকে রাগী চোখে তাকাল।
তপন রাজার প্রশ্নটা শুনে রাগলেন না। বললেন, "সাতাত্তরে যখন আমরা ক্ষমতায় এসেছিলাম, তখন মানুষ একটা বেটার গভরনেন্সের জন্যই ভোট দিয়েছিল। এখনও তাই করেছে। মানুষ আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এটা না মেনে নেওয়ার কিছু নেই। প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। আপনাদের উল্টো প্রশ্ন যদি আমি করি এবার? মানুষ কাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে? যে লোকটা একুশে জুলাইয়ে নেতৃত্ব দিল, সে ওদের দলে। যে মানুষটা এতদিন বামপন্থী দল করে ক্ষমতায় থেকে টাকা কামাল, সেও জামা পাল্টে শাসকে ভিড়ে গেল। যে লোকটা তখনও শাসক ছিল, সে এখনো শাসক থাকল। তাহলে মানুষ কাদের হারাল আর কাদের জেতাল? বলতে পারবেন?"

তপন চা শেষ করে সিগারেট ধরালেন।
সোনালী বলল, “আর কী কী দোষ দেখতে পান আপনি আপনাদের পার্টির?”
তপন কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, “যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সেই ক্যান্ডিডেটকে চাকরি না দিয়ে পার্টি ক্যাডারদের চাকরি দেওয়া হয়েছে। সরকারি চাকরির বহুক্ষেত্রে পার্টি হস্তক্ষেপ করেছে। এটা সত্যবাবুর প্রধানমন্ত্রী না হবার থেকেও বেশি ঐতিহাসিক ভুল। চাকরি যোগ্য মানুষেরই পাওয়া উচিত ছিল। এই বিনা যোগ্যতায় চাকরি পাওয়ার পর পার্টি ক্যাডারদের মধ্যে লড়াকু মানসিকতাটাই চলে গেছে। এত বছর ক্ষমতায় থেকে আমরা এক সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষকে উন্নীত করেছি সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে। আগামী দিনে পার্টির পতনের মূলে এই সুবিধাবাদী শ্রেণী থাকবে যারা আরেকটু বেশি সুবিধা পেলেই জামা পাল্টে ফেলবে। ফেলেওছে অবশ্য বহু মানুষ। এই ব্লান্ডারটা পার্টি না করলেই পারত”।
সোনালী কথাগুলো শুনে চমকে গিয়ে বলল, “এটা আপনি অন দ্য রেকর্ড বললেন?”
তপন বললেন, “অবশ্যই। এবং বলে যাব। তাতে আমাকে পার্টি থেকে এক্সপেল করলেও আমার কোন রাগ থাকবে না। যোগ্য মানুষ চাকরি পাবে না, এটা কতটা খারাপ একটা জাতির পক্ষে, সেটা বলে বোঝানো সম্ভব না। অযোগ্য পার্টিকর্মীদের অন্য কোন জায়গায় কাজে লাগানো যেত। চাকরি দিয়ে সুবিধাবাদী শ্রেণীটা না তৈরী করলেই ভাল হত। দেখলেন না, শুদ্ধবাবু যেই মুহূর্তে বললেন ডু ইট নাও, সেই মুহূর্তে এই লোকগুলো রেগে গেল। শুদ্ধবাবু খুব ভাল করে বুঝতে পেরেছিলেন এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে ফাইল মুভ করতে কত সমস্যা হয় সরকারি দফতরগুলোয়। সে ঘুঘুর বাসা ভাঙতে গিয়ে যে বিরাগভাজন তিনি হয়েছেন, তখনই অনেকে বুঝে গেছিল, এবার শেষের শুরু হল। আমি বলব তিনি বেশ করেছিলেন। আপনারা দুপুরে এসেছেন। খেয়ে যান। না খেয়ে যাবেন না”।
হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে তপনের এই প্রস্তাবে সোনালী হকচকিয়ে গেল।

৪।

অফিসে এসে সোনালী একটা কপি জমা দিয়েছিল দিলীপের কাছে। ডেস্কে বসতে না বসতেই দিলীপ ডেকে পাঠালেন তাকে। সোনালী দিলীপের কেবিনে ঢুকতে দিলীপ বললেন, "বস"।

সোনালী বসল।

দিলীপ বললেন, "রিপোর্টটা হয় নি সোনালী। এই জিনিস তো গণশক্তি বের করবে। আমরা কেন বের করব? তপনের বাতেলা শোনার জন্য তোমাকে পাঠানো হয় নি এটা বুঝতে না পারলে আমার কিছু করার নেই"।

কথাটা বাজে লাগল সোনালীর। বলল, "দেখুন আমার তো মনে হয় তপন যা বলেছেন, তা দিয়ে স্কুপ নিউজ করাই যায়। তপন পার্টি বিরোধী কথা বার্তাও বলেছেন'।

দিলীপ মাছি তাড়ানোর মত হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন, "ধুস, তুমি এমন সব চাইল্ডিশ কথা বার্তা বল, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তুমি এখনো বড় হও নি"।

সোনালী চুপ করে বসে রইল।

দিলীপ বললেন, "শোন সোনালী, এই সব তপন রায় ফায় সততার পরাকাষ্ঠা সেজে যা বলছে, সেগুলো যাচাই কর আগে। ওই এলাকায় প্রমোটার রাজ নিয়ে একটা খবর কর। নিজে নিজে খবর তৈরী কর। সব শিখিয়ে দিতে হবে?"

সোনালী বলল, "তপন রায়কে জড়িয়ে?"

দিলীপ বললেন, "অবভিয়াসলি। সরাসরি নাম করবে না। প্রাক্তন স্থানীয় বিধায়ক এই এই করেছেন, এভাবে খবরটা তৈরী কর। আমি একটা ড্রাফট করে দিচ্ছি, সেটা দেখে বানিয়ে নাও। কারো নাম নেবে না। এভাবে হবে ব্যাপারটা, স্থানীয় এক মানুষের অভিযোগ, কিংবা বিরোধীরা বারবার বলা সত্ত্বেও তৎকালীন বিধায়ক এই ব্যাপারে কর্ণপাত করেন নি, এভাবে খবরটা কর। বুঝেছো?"

সোনালী বলল, "মিথ্যে খবর?"

দিলীপ কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মিথ্যে খবর বলে কিছু হয় না। খবরটা অভিযোগ। খোঁজ নিয়ে দেখো, ওই এলাকায় অনেক বিল্ডিং উঠেছে পুকুর বুজিয়ে। সে নিয়ে অভিযোগ তো থাকবেই। সেটাকেই রঙ চড়িয়ে বড় করার দায়িত্ব তোমার। পারবে না?"

সোনালী বলল, "চেষ্টা করব"।

দিলীপ বললেন, "ঠিক আছে, তুমি আমার ড্রাফটটা ফলো করে আমাকে দেখিয়ে নাও"।

সোনালী বলল, "ঠিক আছে স্যার। আর একটা কথা"।

দিলীপ বললেন, "কী?"

সোনালী বলল, "তপন রায় বললেন ব্যাঙের ছাতার মত চ্যানেল বা সংবাদপত্র গজিয়ে উঠছে, এগুলো নাকি বন্ধও হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে কি স্যার আমাদের জব সিকিউরিটি বলে কিছু নেই?"

দিলীপ বললেন, "তোমাকে কে ভাবতে বলেছে এসব নিয়ে? একজন সাংবাদিকের কাজ হল অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে যাওয়া। অসংখ্য লোক এই পেশায় আসছে। সবাই কি ভাল কাজ পাচ্ছে? নিজের কোয়ালিটি দেখালে তবেই তো পাবে। তুমি তোমার এক্সপেরিয়েন্স সেভাবেই বাড়িয়ে যাও, যেটা তোমাকে ভবিষ্যতে ভাল কাজ করতে সাহায্য করবে। বুঝেছো?"

সোনালী মাথা নেড়ে দিলীপের কেবিন থেকে বেরোল।

অনামিকা ডেস্কে টালি পাড়া নিয়ে কাজ করছে। সোনালী ওর পাশে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “তোর কী খবর?”
অনামিকা বলল, “খবরই খবর। একের পর এক প্রোডিউসার আসছে টালিগঞ্জে। নতুন প্রোজেক্ট আসছে। কত খবর চাইছিস তুই?”
সোনালী বলল, “সব চিটফান্ড কোম্পানির প্রোডিউসার, তাই না?”
অনামিকা অবাক হয়ে বলল, “তুই হঠাৎ চিটফান্ড নিয়ে পড়লি কেন?”
সোনালী হাসল, “জাস্ট একটা এসব নিয়ে খবর করে উঠলাম তো, তাই মনে হল”।
অনামিকা বলল, “তুই আবার কার খবর করলি?”
সোনালী বলল, “কিছু না। তুই বল, কার ইন্টারভিউ করলি?”
অনামিকা বলল, “মা ভবতারিণী গ্রুপের কর্ণধার তমাল সেনের। এই মুহূর্তে ওরা দুটো সিনেমায় টাকা ঢালছে। সে ব্যাপারেই ওর ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম। বিজনেস এক্সপ্যান্ড করছেন ওরা, রিয়েল এস্টেটে ছিলেন, এবার সিনেমা জগতেও আসবেন। টালিগঞ্জের যা অবস্থা ছিল, আশা করা যায়, খানিকটা হলেও অবস্থার উন্নতি হবে”।
সোনালী বলল, “তপন রায় কিন্তু বলছেন এগুলো সব ভোলাটাইল ইনভেস্টমেন্ট। আজ আছে, কাল নেই। আমাদের চাকরিও নাকি তার মধ্যে পড়ে”।
অনামিকা ভ্রূ কুঁচকে বলল, “কে তপন রায়? ওই লেফটিস্ট লিডার? ধুস! তুই আবার এই ফ্রাস্ট্রেটেড লেফটদের কথা শুনছিস কবে থেকে? হেরে গিয়ে এখন এদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বসের কানে গেলে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে কিন্তু”।
সোনালী বলল, “এসব লোক এত বছর ধরে ক্ষমতায় ছিল। সব ভুলভাল বলবে? আমার তো মনে হয় আমাদের এখন থেকেই অন্য কোন চাকরি দেখা শুরু করা উচিত”।
অনামিকা বলল, “চিল বেবস। এত চিন্তা করলে নাওয়া খাওয়া মাথায় উঠে যাবে। এত চিন্তা করতে হবে না তোকে। তুই নিজের কাজ করে যা। দিলীপদা যা বলেন, সেটা শুনে চল। তারপর একটা শাসালো এন আর আই দেখে বিয়ে করে আমেরিকায় বসে ভাল ভাল ফটো পোস্ট করবি। সিম্পল”।
সোনালী বলল, “শাসালো এন আর আই দেখে বিয়ে করতে চাইলে তো এখনই করতে পারতাম। যাই হোক, আমার ডেস্কে যাই, তুই কাজ কর”।
অনামিকা তার দিকে তাকিয়ে বলল, “রাতে দশরথের বাবা হবে নাকি বস? অনেকদিন বসা হয় না দুই বোনে”।
সোনালী হাসল, “ঠিক আছে”।
অনামিকা খুশি হয়ে বলল, “এই তো লক্ষী মেয়ে আমার”।

৫।

ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে তপনের যোগাসন করা বহুদিনের অভ্যাস। ব্যায়াম শেষে শবাসন করছিলেন, এমন সময় ফোন বেজে উঠল।
তপন দেখলেন রবি ফোন করছে। রবি পার্টির হোলটাইমার। পার্টি অফিসেই থাকে।
তপন ফোন ধরে বললেন, "বল"।
রবি বলল, "দাদা, এই ভোরের দিকে কয়েকজন এসে আমাকে অফিস থেকে বের করে দিয়ে পার্টি অফিস ভাঙচুর করছে। আমি বাধা দিতে গেলে আমার গায়েও হাত পড়েছে। আমি এখন কী করব? ছেলে জোগাড় করব?"
তপন কয়েক সেকেন্ড ফোনটা ধরে বললেন, "তুই আমার বাড়ি চলে আয় এখন। আমি দেখছি"।
রবি বলল, "আচ্ছা দাদা"।
ফোনটা কেটে চুপ করে বসে রইলেন তপন। শ্যামলী ঘুমাচ্ছেন।
রবি এল কিছুক্ষণ পরে। তপন দেখলেন রবি বেশ ভয় পেয়েছে। একবারেই কম বয়সী ছেলে। ছোটবেলাতে রবির বাবা মা মারা গেছেন। পার্টি অন্তপ্রাণ।
বসে কাঁদো কাঁদো মুখে রবি বলল, "ভজাদের কাজ"।
তপন বললেন, "তুই ঠিক আছিস তো?"
রবি বলল, "হ্যাঁ কিন্তু অফিসের ভিতরে যে কাগজপত্র ছিল সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। বলছে জনরোষ। ওরাই এখন পার্টি অফিসটায় ওদের পার্টি অফিস করবে। কী হবে দাদা?"
রবিকে দিশেহারা শোনাল।
তপন বললেন, "একটা বিল্ডিং দখল করে সেটাকে নিজেদের পার্টি অফিস বানালেই কি কমিউনিস্ট পার্টি দখল হয়ে যায় রে? তুই শান্ত হ। এখন আমাদের আবার শুরু থেকে শুরু করতে হবে। এত বছর ক্ষমতায় ছিলাম। হতেই পারে জনরোষ। পৃথিবীর সব মানুষের মন জুগিয়ে চলার কাজ কেউ করতে পারে না। আর আমরা কি সবই ভাল কাজ করেছি?"
রবি বলল, "তাহলে আমি কোথায় থাকব দাদা এখন?"
তপন বললেন, "এখানেই থাকবি। অত ভাবিস না"।
রবি বলল, "আমাদের পার্টির ছেলেগুলোই নিজেদের পার্টি অফিস ওদের হাতে তুলে দিল?"
তপন বললেন, "সেটাই স্বাভাবিক। আমরা একটা সিস্টেম তৈরী করেছিলাম, পার্টি করলে চাকরি পাওয়া যায়। যারা পেয়েছে তারা বাড়িতে কোলবালিশ জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে, আর যারা পায় নি তারা কেউ অন্য দলে গেছে, কেউ অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিছু করার নেই আর"।
রবি বলল, "উপরে জানাবেন দাদা?"
তপন ঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন, "হ্যাঁ। এবার জানাই"।
ফোন করলেন ডিস্ট্রিক্ট কমিটির সেক্রেটারিকে। অরুণ হালদার।
অরুণ ধরলেন, ঘুম গলায় বললেন, "বল তপন"।
তপন বললেন, "পার্টি অফিস দখল হয়ে গেছে দাদা। রবিকে বের করে দিয়েছে মারধোর করে। কাগজপত্র সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। কী করব? আমাদের ছেলেদের দিয়ে পাল্টা আক্রমণ করব?"

অরুণ বললেন, “কোন দরকার নেই। এখন কোন রকম সরাসরি লড়াইতে যাওয়ার দরকার নেই। বরং আমাদের ছেলেরা আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকুক এখন”।

তপন বিস্মিত গলায় বললেন, “মানে? কমিউনিস্ট পার্টির ছেলেরা প্রতিরোধ না করে ঘরে বসে যাবে?”

অরুণ বললেন, “হ্যাঁ। সেটাই করতে বলে দাও। পরে আবার পার্টি অফিস তৈরী করা যাবে। এখন আগে নিজেদের বাঁচাও। রাখলাম”।

ফোনটা কেটে গেল।

তপন হতভম্ব মুখে ফোনের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে রবিকে বললেন, “এখানেই থাক। উপর থেকে অর্ডার এসেছে কিছু করতে হবে না। প্রতিরোধের দরকার নেই”।

রবি বলল, “আমি মার খেলাম, তার জন্য পার্টি কিছু করবে না দাদা?”

তপন রবির দিকে তাকিয়ে হাসলেন, “না”।

রবি বলল, “এরকম জানলে গুজরাটের চাকরিটা করতে চলে যেতাম দাদা। আজকের দিনটা দেখার জন্য পার্টি করি নি। কত শুনেছি তোমাদের কাছে, কীভাবে কংগ্রেসী আমলে এলাকা দখল করেছো, আর আজ পার্টির ছেলে মার খাবে আর পার্টির উচ্চ নেতৃত্ব আপোষ করার কথা বলবে”?

তপন বাইরে সাইকেলের বেলের শব্দ পেয়ে রবিকে বললেন, “কাগজ এসেছে, নিয়ে আয়। ফালতু টেনশন করিস না। আমি দেখছি কী করা যায়”।

রবি বাইরে বেরোল।

তপন ফোন বের করে রঘুবীর যাদবকে ফোন করলেন। রঘুবীর তাকে হারিয়ে ভোটে জিতেছেন। শাসক দলের লোক। পুরনো কংগ্রেসী। পরে দল পাল্টান। একটা রিং হতেই রঘুবীর ফোন তুলল, “হ্যালো”।

তপন বললেন, “আমি তপন রায় বলছি”।

রঘুবীর বললেন, “কী সৌভাগ্য, সকাল সকাল কী মনে করে?”

তপন বললেন, “রঘু, তোমার ছেলেরা আমাদের পার্টি অফিস দখল করে রবিকে মেরে অফিস থেকে বের করে দিয়েছে। এটা কি তুমি জানো?”

রঘুবীর বললেন, “না দাদা, আমি তো জানি না। আর আমাদের তো স্পষ্ট নির্দেশ ছিল জেতার পরে এসব যেন না হয়। আমি এখনই দেখছি। তবে একটা কথা বলি তোমায় দাদা, এই কাজগুলো কিন্তু তোমাদের পুরনো ছেলেগুলোই করে”।

তপন হাসলেন, “সে তো জানি। এছাড়া আর কে করবে? যাক গে, তুমি দেখো। বিরোধীরাও গণতন্ত্রের অংশ, আশা করি সেটা তুমি অস্বীকার করবে না”।

রঘুবীর বললেন, “আরে দাদা লজ্জা দেবেন না। আপনার সঙ্গে কি আজকের সম্পর্ক? রাজনীতির বাইরেও আমরা তো মানুষ নাকি? আমি আজকের মধ্যেই ব্যাপারটা মিটিয়ে দিচ্ছি”।

তপন বললেন, “ধন্যবাদ ভাই”।

ফোন রেখে দেখলেন রবি ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

তপন বললেন, “কী রে, কী হল?”

রবি কাগজটা এগিয়ে দিল।

তপন দেখলেন যে মেয়েটা তার ইন্টারভিউ নিয়ে গেল সে রিপোর্ট করেছে তপন রায় এলাকার পুকুর বুজিয়ে প্রমোটারদের মদত দিয়েছেন। পরিবেশের ক্ষতি করেছেন এবং এর জন্য এলাকার মানুষ তার উপরে ক্ষুব্ধ।

কাগজটা দেখে হেসে ফেললেন তপন।

রবি বলল, “হাসছো দাদা? যে লোকটা কোন দিন কারো থেকে দু টাকার চা পর্যন্ত খেল না তার নামে এত বড় একটা খবর করে দিল? কিছু বলবে না? এভাবে হাসবে শুধু?”

তপন কাগজটা টেবিলে রেখে বললেন, “অনুলোম বিলোম কর রবি। অভ্যাসটা ভাল। সব রাগ চলে যাবে। এই দিকে আয়। বস”।

রবি হতভম্ব হয়ে তপনের দিকে তাকিয়ে রইল।

৬।

সোনালী ঘুমিয়ে ছিল। মা তার ঘরে এসে কাগজটা দিয়ে বলল, "ওরে তোর নিউজ তো এক্কেবারে ফার্স্ট পেজে বেরিয়েছে। আজ বিরাট ব্যাপার তো"।
সোনালী উঠে বসে বলল, "ফ্রন্ট পেজে? কই দেখি?"
মা কাগজটা সোনালীকে দিল।
সোনালী খবরটা দেখে শক মত খেল। এসব তো সে কিছুই লেখে নি। রিপোর্টার হিসেবে নামটা তারই ব্যবহৃত হয়েছে, ভিতরের খবরটা অন্য কেউ করেছে। সে কয়েক সেকেন্ড মুখ ঢেকে বসে রইল।
মা উদ্বিগ্ন গলায় বলল, "কী রে, কী হল?"
সোনালী বলল, "কিছু না। যাও, আমি আসছি"।
মা বলল, "কী হয়েছে বলবি তো। তোর রিপোর্ট ফার্স্ট পেজে বেরিয়েছে, এটা আনন্দ করার মত ব্যাপার না বলছিস?"
সোনালী বলল, "হ্যাঁ সেই বটে। এই রিপোর্টে আমার নামটাই গেছে শুধু। রিপোর্টটা আমি লিখি নি"।
মা হতভম্ব গলায় বলল, "তবে?"
সোনালী বলল, "তবে আর কী? চাকরিটা ছাড়তে হবে। এরকম চাকরি আমি করব না যেখানে এরকম জালিগিরি হয়"।
মা বলল, "বিয়েটা করে নে না। এসব উল্টোপাল্টা চাকরি করে কী হবে?"
সোনালী বলল, "তাই করব। ছেলে দেখো। আমি এ চাকরি করব না"।
সোনালীর বাবা সন্দীপ ঘরে এসে বললেন, "কী হল? সকাল সকাল কী নিয়ে পড়লি তোরা?"
মা বলল, "এই যে ওদের কাগজে ওর নামে যে খবর বেরিয়েছে, সেটা নাকি ভুয়ো ব্যাপার। নামটা ওর দিয়েছে, খবরটা ও করে নি"।
সন্দীপ পেপারটা নিয়ে দেখলেন। বললেন, "হু, তপন রায়। চিনি তো। দ্যাট ফেমাস লিডার। তার নামে খবর করেছে! তোর নাম ইউজ করে?"
সোনালী বলল, "হ্যাঁ। আমি এই কাজটা করতে পারব না বাবা। এরা লোক ভাল না"।
সন্দীপ বললেন, "সে তো বুঝতেই পারছি। একটা সাম্রাজ্যের পতনের পর অনেক সাহসী লোক বেরিয়ে আসে। এরা যখন পাওয়ারে ছিল তখন এই ভুলভাল নিউজটা করলে এতদিন সেই রিপোর্টারকে খুঁজে পাওয়া যেত না। যাক গে, এদেরও অনেক দোষ ছিল। তুই এসব নিয়ে বেশি ভাবিস না। এগুলো সব পার্ট অফ দ্য গেম"।
সোনালী বলল, "পার্ট অফ দ্য গেম মানে কী বাবা? লেফট কী করে গেছে সেসব নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। আমার চিন্তা শুধুমাত্র আমাকে নিয়ে। যেখানে আমি এই লেখাটা লিখিই নি, তারা কোন সাহসে আমার নাম নিয়ে এরকম রিপোর্ট বানিয়ে ফেলবে?"
সন্দীপ চিন্তিত গলায় বললেন, "সেটাও ঠিক। তবে ভদ্রলোক এটা নিয়ে মানহানির মামলা করলেও তুই ফাঁসবি না, তোর পেপারই ফাঁসবে। ওরা হয়ত তোকে এগিয়ে দেবে। তাতেও কিছু যায় আসবে না। পুরো রিপোর্টটাই অভিযোগের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। অত চিন্তা করিস না। কাজটা করতে চাইলে কর"।
সোনালী থমথমে মুখে বসে রইল।

বাবা মা দুজনেই ঘর থেকে বেরোলে সোনালী কাবেরীকে ফোন করল। কাবেরী ফোন ধরে বললেন, "কনগ্রাচুলেশন্স। ইওর স্টোরি হ্যাজ বিন পাবলিশড"।

সোনালী বলল, "রিপোর্টটা আমি লিখিনি দিদি। আমি কেন এরকম উলটো পালটা লেখা লিখব বল তো? দিলীপদা নিজেই লিখে আমার নামটা দিয়ে ছেপে দিলেন। এটা কি ঠিক হল?"

কাবেরী বললেন, "ইট হ্যাপেন্স সোনালী। একবারেই নীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। তবে কাল তোর থেকে কোন রিপোর্ট নিয়েছিলেন কী উনি?"

সোনালী বলল, "হ্যাঁ, নিয়েছিলেন"।

কাবেরী বললেন, "ওতেই তোর সই ছিল। ওটাতেই মনের সুখে এডিট করে বের করে দিয়েছে তোর নামে। তপনদাকে একটা ফোন করে সরি বলে দিস। উনি কিছু মনে করবেন না"।

সোনালী হতভম্ব গলায় বলল, "আমি ফোন করব? ক্ষেপেছো তুমি?"

কাবেরী বললেন, "হ্যাঁ, কী আর হবে? খুব বেশি হলে ঝাড়বে। কিন্তু তুই ক্লিন থাকবি"।

সোনালী থমথমে মুখে বসে রইল।

৭।

সোনালীর সকালে এতটাই অস্বস্তি হচ্ছিল, সে আর অফিস যেতে পারল না। শরীর খারাপ হয়েছে বলে কাটিয়ে দিল। তপনের বাড়ি যখন পৌঁছল তখন দুপুর সাড়ে বারোটা। কলিং বেল বাজালে তপন দরজা খুলে তাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "এসো"।

সোনালী খানিকটা ঘোরের মধ্যেই চলে এসেছিল। সে বলল, "আমি সরি বলতে এসেছি একচুয়ালি"।

তপন বললেন, "ঠিক আছে, ভিতরে এসো। এই রোদে এসেছো যখন, বসে যাও"।

সোনালী ড্রইং রুমে ঢুকে দেখল একটা ছেলে বসে কাগজ পড়ছে। তাকে দেখে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আবার কাগজে মন দিল।

তপন সোনালীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "খবরটা তুমি কর নি তাই তো? দিলীপই লিখেছে, তোমার নাম দিয়ে চালিয়েছে। ঠিক না?"

সোনালী অবাক চোখে তপনকে দেখে বলল, "কী করে বুঝলেন?"

তপন বললেন, "রবি, দেশলাইটা দে তো"।

রবি দেশলাই দিল।

তপন সোনালীর দিকে তাকালেন, "স্মোক করলে সমস্যা নেই তো"?

সোনালী মাথা নাড়ল।

তপন সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "এ পাড়ার দুটো পাড়া পরে একটা পুকুর ছিল। তোমাদের এডিটর ভদ্রলোক সে পুকুর বুজিয়ে বিল্ডিং করতে চেয়েছিলেন। প্রমোটিংও করেছেন তিনি এককালে। প্রমোটিং ঠিক না, দালাল বলতে পারো। তা সে পারমিশন আমি দিই নি। তারই রাগ মিটিয়েছে এই নিউজটা করে। তুমি আসার আগেই আমি জানতাম এই নিউজ তুমি লেখো নি"।

সোনালী অবাক হয়ে বলল, "মানে আপনার উপর ব্যক্তিগত রাগ থেকে এটা করলেন উনি?"

তপন বললেন, "একেবারেই। এবার খুব বেশি হলে শাসকদল আমার নামে ভিজিল্যান্স কেস দিতে পারে একটা। এর বেশি কী করবে আর? ওকে দেখো, ওর নাম রবি। আমাদের পার্টির হোল টাইমার। পার্টি অফিসে থাকে, ওখানেই খায় দায়, ওখানেই ঘুমায়। ওরা আমাদের পার্টি অফিসে ভাংচুর চালিয়ে রবিকে মারধোর করে পার্টি অফিস থেকে বের করে দিয়েছে। এই খবরটা তোমার এডিটর করবে? করবে না। সংবাদমাধ্যমকে বলা হয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। অথচ কোথায় সে স্তম্ভ কাজ করছে? শাসক দলের হয়েই যদি সবাই কাজ করে, তাহলে শাসক দল ভুল করলে তার বিরুদ্ধে কে বলবে? অবশ্য সেটা বলেই বা কী হবে, আমার নিজের পার্টির নেতৃত্বই ভয় পেয়ে ঘরে বসে যেতে বলছে। চিটফান্ডের ফান্ডে চলা নিউজ পেপারকে আর দোষ দিয়ে কী হবে?"

শ্যামলী এ ঘরে এলেন। তপন বললেন, "ওদেরও খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে"।

সোনালী আপত্তি করল, "না না, আমি খাব না"।

তপন বললেন, "আরে তুমি ওসব চিন্তা কোর না। আমাদের বাড়িতে অভ্যাস আছে। বামপন্থা মানে কেউ অভুক্ত থাকবে না। যদিও আমরা সেটা কতটা পেরেছি, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তবু, একজন বামপন্থী হিসেবে আমরা খাব, আর এই ভরদুপুরে তুমি না খেয়ে চলে যাবে, সেটা মেনে নেওয়া যাবে না"।

শ্যামলী রবিকে ডেকে ডিম আনতে বলে দিল। রবি বেরোল। সোনালী বলল, "আমার সকাল থেকেই খুব খারাপ লাগছে নিউজটা দেখে। আমার নামে এভাবে মিথ্যা কথা ছেপে দিল। আমি ঠিক করেছি চাকরিটা

ছেড়ে দেব”।
তপন বললেন, “আজকালকার বাজারে চাকরি ছেড়ে দেবে? কেন? কী দরকার? যেরকম চলছে চলতে দাও। শুধু মনে রেখো, শাসক দলের বিরুদ্ধে কিছু লিখো না। বামই হোক কিংবা রাম, যে যায় লংকায়, সে হয় রাবণ”।
তপনের ফোন বাজছিল। তপন কিছুক্ষণ ফোনে কথা বলে সোনালীকে বললেন, “যাক, আমাদের অফিসটা ফেরত দেবে। এলাকার নব নির্বাচিত এম এল এ কথা দিল”।
সোনালী অবাক হয়ে বলল, “আপনার সঙ্গে লোকাল এম এল এ কথা বলল?”
তপন বললেন, “কেন বলবে না? সংসদীয় গণতন্ত্রে ভোটে যেতার পর বিজয়ী তো আর শুধু সে পার্টির থাকে না। সবার হয়ে যায়। সেটা নিয়ে এত বিস্ময়ের কী আছে? তাছাড়া আমি কোনকালেই বিরোধীদের সঙ্গে বিরূপ আচরণ পছন্দ করি না। যদিও এ রাজ্যে সেই কালচারটা ভাল পরিমাণেই আছে। ইভেন আমার দলেও আছে”।
তপন রবিকে ফোন করে কিছু কথা বলে সোনালীকে বললেন, “আমরা খেয়ে বেরোবো। দেখে আসি পার্টি অফিসটা সত্যিই ফেরত দিল নাকি। তুমি যেতে চাইলে যেতে পারো। অবশ্য আজ ফটোগ্রাফার আসে নি”।
সোনালী বলল, “না আমি যাব। এখান থেকে যদি কোন স্টোরি হয়, সেটা করব না হয়”।
তপন বললেন, “কী লাভ? তুমি যে স্টোরি করবে, সেটা তোমার এডিটর কিছুতেই অ্যাপ্রুভ করবে না। তবে এক্সপেরিয়েন্স বাড়বে। সেটার জন্য যেতে পারো। আজকে এই পার্টি অফিস দখল দেখে একটা কথা মনে পড়ে গেল। চৌত্রিশ বছর আগে আমরা যখন জিতে আসি, তখন আমাদেরও অনেক বার বলে দেওয়া হয়েছিল, কিছুতেই যেন বিরোধীদের হামলা না করি। আমরা সেটা মেনে চলেছিলাম। তবে প্রবাদ আছে বাজারে, আমরা হাতে মারি না, ভাতে মারি। এই ছেলেগুলো, যারা এখন পালটি খেয়েছে, এরা প্রার্থনা করুক, আমরা যেন আর কোনদিন ফিরে না আসি। আমরা না এলেই মঙ্গল”।
সোনালী বলল, “বুঝলাম না”।
তপন হাসলেন, “বুঝতে হবে না”।
#
দুপুরে ডাল, ভাত আর অমলেট দিয়ে সবার সঙ্গে খেল সোনালী। সে দেখল তাদের সঙ্গে শ্যামলীও বসেছেন।
খাওয়া হলে শ্যামলী সোনালীকে বলল, “এসো আমার ঘরে একটু বসে না হয় বেরিও”।
সোনালীর ভাল লাগছিল। আন্তরিকতা আছে সবার। মনে হচ্ছিল না কোন অচেনা বাড়িতে সে এসেছে।
সোনালী শ্যামলীকে জিজ্ঞেস করল, “আপনি রাজনীতি করেন নি?”
শ্যামলী হাসলেন, “নাহ, সক্রিয়ভাবে কখনোই করি নি”।
সোনালী বলল, “পরোক্ষভাবে কীভাবে রাজনীতি করা হয়?”
শ্যামলী বললেন, “তখন সবে বিয়ে হয়েছে। কংগ্রেসী আমলে পার্টির বিভিন্ন লোক এদিক সেদিক পালিয়ে বেড়াত। আমাদের বাড়িতেও এসেছে। তখন এভাবেই তারা খেয়ে গেছেন। এর বেশি কখনো জড়াই নি”।
সোনালী বলল, “অনেক সময়েই দেখা যায়, কোন সিট মহিলা ক্যান্ডিডেটের জন্য সংরক্ষিত হয়ে গেলে সেখানে নেতা না দাঁড়িয়ে নেতার স্ত্রী ভোটে দাঁড়ান। আপনাকে কখনো এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হয় নি?”
শ্যামলী বললেন, “না। সেক্ষেত্রে উনি কোন সক্রিয় মহিলা পার্টি কর্মীকেই সিট দেওয়ার কথা বলে এসেছেন। পার্টিতে এই রীতি আছে বটে, তবে আমি যেহেতু সক্রিয়ভাবে ব্যাপারটা করতে চাই নি, উনি আমাকে জোর করেন নি”।
সোনালী বলল, “আপনাদের ছেলে মেয়ে?”

শ্যামলী বললেন, “ছেলে দিল্লিতে থাকে। কখনও সখনো আসে”।
সোনালী মাথা নাড়ল, “আপনার যেতে ইচ্ছে হয় নি?”
শ্যামলী বললেন, “গেছি বার কয়েক। থাকতে ইচ্ছা করে না। নিজের এলাকা ছেড়ে থাকা যায়, বল?”
সোনালী হাসল, “তা ঠিক”।
শ্যামলী বললেন, “এই যে এই বাড়ি দেখছো না, এখন একটাও লোক নেই, ভোটে হেরে গেছে বলে? একটা সময় সারাক্ষণ মানুষ গিজগিজ করছে। উনি আমাকে বলেছিলেন, রাজনীতি এমনই। যখন ক্ষমতা থাকবে, তখন মানুষ পারলে পায়ে ধরবে। ক্ষমতা চলে গেলে কেউ থাকে না। টাকার নেশার থেকেও বেশি হল ক্ষমতার নেশা। রাজনীতি মাত্রেই ক্ষমতা... আর কিছু না”।
সোনালী বলল, “ঠিকই বলেন... ভুল কিছু বলেন না”।
তপন বাইরে থেকে ডাক পাড়লেন, “গেলে চল। বিশ্রাম নিতে চাইলে নিতে পারো অবশ্য”।
সোনালী উঠল, “না। আমি যাব”।

৮।

বাজারে দোকান পাট সব বন্ধ। পার্টি অফিস ঘিরে একগাদা লোক।
কটূক্তি ভেসে আসছে। কিন্তু রঘুবীরের নির্দেশ ছিল বলেই তার বেশি কিছু হল না। তপন শান্ত মুখে পার্টি অফিসে প্রবেশ করলেন। সোনালী দেখল ছবি নামিয়ে ফ্রেমগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে।
পোড়া গন্ধ। কাগজ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার চিহ্ন মেঝেতে। তপন সোনালীকে বললেন, "পনেরো জন এল সি এম। মানে লোকাল কমিটির মেম্বার। জোনাল কমিটিতে ধরে নাও আরো জনা দশেক আছে। জেলা, রাজ্য কমিটিতেও আরো কত কত লোক। ব্রাঞ্চেও। অথচ এখানে আমি একা এলাম। আর কেউ নেই। তুমি কাল জিজ্ঞেস করছিলে না কেন আমরা হেরে গেছি? এই কারণে হেরে গেছি। আমরা যে শ্রেণীটাকে তৈরী করেছি, তারা কমিউনিস্ট পার্টি তৈরী করে নি। একটা মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদীর দল তৈরী করেছিলাম যারা ভোটে হেরে গেলে বাড়িতে গিয়ে বসে থাকে ভয়ে। যারা নির্দেশ দেয়, এখন প্রতিরোধের সময় নয়, এখন আত্মরক্ষার সময়। কমিউনিস্ট পার্টি তৈরী হবে শ্রমজীবী মানুষ আর কৃষকদের প্রাধান্যে। আমরা ক্ষমতায় থাকার অধিকার হারিয়েছি বলে হেরে গেছি। খুব সিম্পল"।
বাইরে থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল, "এই জমিচোর"।
তপন বাইরে গেলেন। বললেন, "আপনারাও জানেন আমি জমিচোর নই। অকারণ চেঁচিয়ে শরীর খারাপ করে লাভ আছে? দুপুরবেলা কী দরকার অন্য দলের পার্টি অফিসে ভিড় করে?"
তপনের হঠাৎ করে এগিয়ে যাওয়াটা ভিড়টাকে ঘাবড়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিড়টা সরে গেল।
তপন রবিকে বললেন, "তুই একা থাকতে ভয় পাবি, আজকের রাতটা আমিও তোর সঙ্গে থাকব"।
রবি হতভম্ব হয়ে বলল, "আর বউদি?"
তপন বললেন, "বউদিকে নিয়ে চলে আসব। খিচুড়ি আর অমলেট খাব। পিকনিকের মত পরিবেশ। কী বলিস?"
সোনালী চমৎকৃত হল। এই পরিবেশেও লোকটা সাহস হারান নি।
তপন রঘুবীরকে ফোন করলেন। রঘুবীর বললেন, "হ্যাঁ তপনদা সব ঠিক আছে তো?"
তপন বললেন, "হ্যাঁ ভাই। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ বিরোধী রাজনীতিটা করতে দেওয়ার জন্য"।
রঘুবীর বললেন, "দেখো দাদা, কোন কোন জায়গায় তোমাদের লোকেরাও তো কম জ্বালাতন করে নি। সেখানে পাবলিক রেগে গিয়ে এখন ঝামেলা করলে সেগুলোও আমরা আটকাতে চেষ্টা করছি। কিন্তু যে তপন রায় কোন দিন কারো থেকে এক টাকাও ঘুষ নেয় নি, সে লোক আমাকে বললে আমি তো দেখবোই। তবে একটা কথা দাদা, ওই দল করে আর কী হবে? বুড়োদের দল, তোমাদের মত লোকেদের কিন্তু ওরা আরো ঝামেলায় ফেলে দেবে। তুমি আমাদের দলে চলে এসো"।
তপন হো হো করে হেসে বললেন, "তুমি ভাল লোক রঘুবীর। সবাই তোমার মত হয় না। যাই হোক, মন দিয়ে কাজ কর। ভাল থেকো"।
ফোন রেখে তপন রবিকে বললেন, "এবার উচ্চ নেতৃত্বকে জানাতে হবে। তুই জানিয়ে দে। আমার পোষাচ্ছে না"।
রবি তপনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ফোন বের করে ফোন করল।
কিছুক্ষণ কথা বলে তপনকে বলল, "উচ্চ নেতৃত্ব বলছে এভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে পার্টি অফিস খোলার মানে হয় না। আমরা ঠিক করি নি"।

তপন বললেন, “হ্যাঁ, সবাই ঘরে বসে কিংবা এলাকা ছাড়া হয়ে হরি কেত্তন গাইবে, তাহলে ওদের ঠিক হয়। কী করতে এরা পদ আঁকড়ে পড়ে আছে কে জানে”।
রবি বলল, “উনি আজকের নিউজটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। পার্টিতে তদন্ত হতে পারে জমির খবর নিয়ে”।
তপন বললেন, “বেশ তো। হোক। এক্সপেল করে দিক। তাহলে যদি পার্টি ভাল চলে চলবে। যত্ত সব। যাক গে”...
তপন পকেট থেকে টাকা বের করে রবিকে দিয়ে বললেন, “ভাল চাল ডাল কিনে রাখবি। আমি তোর বউদিকে নিয়ে আসব আজ। দেখি, পার্টি অফিস থেকে কে আমাদের তাড়ায়। ময়দান ছেড়ে পালাবো নাকি? তাহলে আর বাকিদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ কোথায়? আমরা খুন করেছি না ডাকাতি যে রাজত্ব চলে গেলে পালিয়ে বেড়াতে হবে? লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই স্লোগানটা শুধু কথার কথা হয়ে যাবে?”
সোনালী তপনের দিকে তাকাল। এরকম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানুষেরাই আজকাল বিরল হয়ে যাচ্ছে।
রবি বলল, “কিন্তু দাদা, পার্টি তোমাকে এক্সপেল করলে কী করবে?”
তপন বললেন, “এক্সপেল করতে হলে ওদের সব কিছু প্রমাণ করতে হবে। তা আগে করে দেখাক। আর কত জনকে এক্সপেল করবে? কারা করবে এর পরে পার্টি? শুধু লবি বাজি আর এর ওর পেছনে কাঠিবাজির নাম কমিউনিস্ট পার্টি কবে থেকে হয়েছে?”
রবিকে দেখে খুব একটা আশ্বস্ত বলে মনে হল না।
তপন সোনালীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি আর দেরী কোর না। আর ওই খবরটা নিয়ে কোন অপরাধবোধে ভুগো না। মনে রেখো, একটা মিথ্যে খবর কিছুদিনের জন্য কিছু মানুষের মনকে ঢেকে রাখতে পারে। সত্যের আলো এত তীক্ষ্ণ হয়, তাতে কোন কালো ঢাকা পড়ে না। কোন দিন ভুলো না। চেষ্টা কোর এমন কোন কাগজে চাকরি করতে, যারা অন্তত তোমাকে একটা জায়গা দেবে সত্যিটাকে সামনে আনার”।
সোনালী বলল, “মনে রাখব। আমি আসি স্যার”।
তপন রবিকে বললেন, “ওকে একটা অটোয় তুলে দিয়ে আয়। এখনো উচ্চিংড়েগুলো আশে পাশে আছে। সেরকম দেখলে আমায় ফোন করবি”।
রবি বলল, “ঠিক আছে”।

৯।

পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে রবি বলল, "দাদা আছে বলেই আমি এখনো আছি। নইলে কবে সব ছেড়ে ছুড়ে বাইরে চলে যেতাম"।

সোনালী বলল, "আপনি পার্টি করবেন বলে এখানে পড়ে আছেন? কীসের জন্য?"

রবি হাসল, "জানি না। তবে আমার মনে হয় ওরা দাদাকে পার্টি থেকে বের করে দেবে। এ অঞ্চলে সাংঘাতিক লবি জানেন না। দাদা এমনি এমনি হারে নি। দাদার নিজের দলের লোকই দাদাকে হারিয়ে দিয়েছে। এক পার্টির সবাই তো ভাল হয় না। অন্য লবির লোকেরাই হারিয়ে দেয়। আগের বার লালের দিকে হাওয়া ছিল, সাবোতাজ হলেও জিততে সমস্যা হয় নি। এবার যদি সবাই মিলে লড়াই করত তাহলে সিটটা বেরোলেও বেরোতে পারত, কিন্তু তা হয় নি"।

সোনালী বলল, "মানে? শুধু নিজের লবির লোক না বলে নিজের পার্টির লোককেই ভোটে হারিয়ে দেওয়া হয়? এটা হয়?"

রবি বলল, "ও বাবা, আপনি দেখি আকাশ থেকে পড়লেন। আপনি কি ভাবলেন ওঁরা এমনি এমনি জিতে গেল? বামফ্রন্ট যখন সাতাত্তরে ক্ষমতায় এসেছিল, তখনও কি শুধু বামপন্থীরাই বামফ্রন্টকে ভোটে জিতিয়ে ক্ষমতায় এনেছিল? তা হলে তো হয়েই যেত। ব্যাপারটা অত সোজা না। একটা দলে অনেক রকম মানুষ থাকে। একদল এক রকমভাবে চলতে চায়। আরেক দল আরেক রকমভাবে। আর দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলে মানুষের মনে একটা দম্ভ আসে। অহংকার আসে। সেটা আমাদের দলের অনেকের মধ্যেই এসে গেছিল, আপনি নিশ্চয়ই ভাল করে জানেন। তপনদা এই সব লোককে দু চোখে দেখতে পারতেন না। তিনি যা নয় তাই বলে দিতেন মুখের ওপরে। প্রমোটাররা দাদাকে যমের মত ভয় পেত। এসব লোক কী করে টিকবে বলুন? আমাদের পার্টিরই কত নেতা আছে, যারা ভোটে জিতলে চাল ডাল কিনত না। বাজার থেকে ঠিক রেশন চলে আসত। দিক তো তপনদাকে কেউ ওরকম। ওখানেই তার বারোটা বাজিয়ে দেবে"।

সোনালী বলল, "ছি ছি, আর এমন লোকের বিরুদ্ধে এরকম একটা রিপোর্ট বেরিয়ে গেল আমার নামে?"

রবি অবাক হয়ে বলল, "আপনার নামে মানে? এই রিপোর্টটা যেটা আজ কাগজে বেরিয়েছে, আপনি করেছেন?"

সোনালী বলল, "ঠিক আমি না, ওরা আমার নামটা ব্যবহার করে এই বাজে রিপোর্টটা করেছে। আমি সেই ব্যাপারে ক্ষমা চাইতেই এসেছিলাম তপনবাবুর কাছে"।

রবি খানিকটা গম্ভীর হয়ে বলল, "তা হবে হয়ত, সকাল থেকে এমন সব যাচ্ছে, এসব ব্যাপারে আর মাথা ঘামাতে পারি নি। এই এলাকায় তো দাদার জন্যই পড়ে ছিলাম। সেখানে যদি ওকেই পার্টি থেকে এক্সপেল করে তাহলে কিছুতেই আমি আর পার্টি করতে পারব না। আমি বেরিয়ে যাব"।

অটোস্ট্যান্ড চলে এসেছিল।

রবি সোনালীকে অটোতে উঠিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সোনালীর খারাপ লাগছিল। রাগও হচ্ছিল।

সে স্টেশনে গিয়ে ঠিক করল অফিসে যাবে।

দেড় ঘন্টা পরে ঘেমে নেয়ে অফিসে ঢুকে দিলীপের কেবিনে পৌঁছে দেখল দুজন বসে আছে আগে থেকেই। সোনালী সে সবের তোয়াক্কা না করে দিলীপের কেবিনে ঢুকে বলল, "কাজটা ভাল হয় নি স্যার"।

দিলীপ তার দিকে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে বললেন, "তুমি পরে এসো। আমাদের এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মিটিং চলছে"।
সোনালী দেখল তার গলার স্বর শুনেই সম্ভবত দিলীপের সামনে বসা একজন তার দিকে ফিরে তাকালেন।
সোনালী চিনতে পারল।
শাসক দলের খুব বড় নেতা। এবার মন্ত্রী হতে চলেছেন।
সে "সরি" বলে দিলীপের কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।
কাবেরী তাকে ডাকলেন। সোনালী কাবেরীর কাছে গিয়ে বসল। হাঁফাচ্ছিল সে।
কাবেরী বললেন, "তুই দিলীপদাকে ঝাড়তে গেছিলি?"
সোনালী বলল, "আমি তপনবাবুর বাড়ি গেছিলাম ক্ষমা চাইতে"।
কাবেরী সোনালীর কাঁধে হাত রাখলেন, "ঠিক আছে। তপনদা কেমন লোক আমিও জানি। তা বলে এত ইমপালসিভ বিহেভিয়ার করবি কেন তুই? মাথা ঠান্ডা রাখ পাগলী। এখনই এত রিয়্যাক্ট করার কিছু হয় নি। সাংবাদিকরা যদি এত মাথা গরম করে ফেলে, তাহলে কী করে কী হবে বলত?"
সোনালী বলল, "তোমার সঙ্গে এই ব্যাপারটা হলে কী করতে কাবেরীদি?"
কাবেরী বললেন, "তোর কি মনে হয় আমার সঙ্গে এরকম হয় নি? কম বেশি সবার সঙ্গেই এরকম হয়। তা বলে তুই এখনই বিদ্রোহ করলে চাকরিটাই তো চলে যাবে। তোকে সিস্টেমে থেকেই সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তুই জানিস তোর নামে যেটা বেরিয়েছে, সেটা মিথ্যে খবর। কিন্তু এখন এটাকেই তোকে মেনে নিতে হবে। আমার নামে যখন এরকম নিউজ বেরোত, তখন আমিও রাগ করতাম। কিন্তু এত বছর এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে। এখন দিলীপদার সেই সাহস হবে আমার নামে এরকম নিউজ বের করতে? তোকেও সেই জায়গায় আসতে হবে। আগে পায়ের নিচের মাটিটা শক্ত কর। তারপর না হয় উপরের লোকের ফ্লোরে ভূমিকম্প তৈরী করবি। বুঝলি?"
সোনালী মাথা নাড়ল।
কাবেরী বললেন, "দিলীপদার চেম্বারে যিনি এসছেন, শোনা যাচ্ছে মন্ত্রী হবেন। দিলীপদার বন্ধু। সেক্ষেত্রে আমাদের পেপারের ভালই হবে বুঝতে পারছিস আশা করি"।
সোনালী বলল, "দিলীপদা তো প্রমোটারদের সঙ্গে মিলে তপনবাবুর এলাকায় সুবিধা করতে পারে নি বলে এখন তপনবাবুর ওপর দিলীপদার এত রাগ"।
কাবেরী ঠোঁটে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সোনালীকে আলতো ধমক দিলেন, "একদম এসব নিয়ে কোন কথা বলবি না। সব খানে সব কথা গড়গড় করে বলে দিলে তুইই বিপদে পড়বি। মাথা ঠান্ডা কর বাবু। আর দিলীপদা যা ভাট বকবে, চুপ করে শুনে যাবি। আমি দেখছি যাতে ইন ফিউচার, তোর নাম ইউজ করে এরকম ভুল ভাল নিউজ দিলীপদা আর বের না করেন। ঠিক আছে?"
সোনালী মাথা নাড়ল।
কাবেরী বললেন, "যা ডেস্কে গিয়ে বস। বেশি ভাবিস না"।
সোনালী ডেস্কে গিয়ে বসল। তার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছিল। ইচ্ছে করছিল সব ফেলে ফুলে দিয়ে রেজিগনেশন লেটারটা জমা দিয়ে বেরিয়ে যায়। হঠাৎ কানে তপনবাবুর কথাটা ভেসে এল, "ময়দান ছেড়ে পালানোটা কোন কাজের কথা না। লড়াইটা করে যেতে হবে। যে কোন অবস্থায়। যে কোন ভাবে। লড়াই না করে ময়দান থেকে পালালে তাকে কাপুরুষ বলে"।
সোনালী চোখ বন্ধ করল। মাথার ভিতরে একটা কথা পাক খেতে লাগল, "লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই"।

১০।

"সুস্থ গণতন্ত্র কোন সরকারকে চৌত্রিশ বছর ক্ষমতায় রাখতে পারে না। এ রাজ্যে সুস্থ গণতন্ত্রের চাষ হয়েছে কি আদৌ?"

প্রশ্নটা শুনে বাবার দিকে তাকাল সোনালী।

সে বলল, "জানি না"।

সন্দীপ বললেন, "একটা দলের সবাই ভাল হতে পারে না। আবার একটা দলের সবাই খারাপও হতে পারে না। মানুষের যেটা সব থেকে বেশি মাথায় রাখা দরকার, সেটা হল, কোন দলে ভাল মানুষের সংখ্যা বেশি। এখন তো হানিমুন পিরিয়ড চলছে। চৌত্রিশ বছর কাটিয়ে একটা সরকারের পতন ঘটেছে। এখন যে এসেছে, তার সবই ভাল লাগবে। লং টার্মে কিন্তু অ্যাসিড টেস্ট হবে। এর থেকে কেরল মডেল অনেক ভাল। যাই হোক না কেন, পাঁচ বছর পর পর সরকার চেঞ্জ হবে। ব্যাপারটা ওখানে মাস্ট। গণতন্ত্রের জন্য এর থেকে ভাল মডেল আর কিছু হতে পারে না। এর ফলে কী হয় বলত? যে পাবলিকগুলো শুধু পালটি মারতে জানে, সে পাবলিকগুলো আর পালটি মারতে পারবে না। মানুষও চিনে যাবে তাদের। শিক্ষিত রাজনীতি একেই বলা হয়। আমাদের রাজ্যের সমস্যা হল, এখানে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিটা বেশি। তুমি আমাদের পার্টি কর মানে তুমি পাবে, তুমি বিরোধী রাজনীতি কর মানে তুমি পাবে না। এর থেকে বাজে জিনিস আর কিছু হয় না। তুই তোর ওই তপন রায়কে জিজ্ঞেস করে দেখবি তো, বিরোধী ক'টা লোক তার আমলে চাকরি পেয়েছে? দেখবি বলতে পারবে না। আমতা আমতা করবে"।

সোনালী বলল, "তাহলে তুমি কী চাও, পাঁচ বছর পর আবার বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ফিরবে?"

সন্দীপ মাথা নাড়লেন, "নাহ, এখানে এটাই তো সমস্যা। যে একবার ক্ষমতায় আসে, তাকে নাড়ানো চাপ হয়ে যায়। সে একবারে লটবহর নিয়ে বসে পড়ে। তার থেকেও বড় কথা হল, বামফ্রন্টে এখন নেতৃত্বের আকাল দেখা দেবে। নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরের পর রাজ্যে লিটারালি কোন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছিল না। এদেরও মনে হয় আর সরকারে থাকার ইচ্ছা ছিল না। জানি না, এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হাল কী হবে। তবে অটোক্রেটিক লিডারশিপের দরকার এ দেশে আছে। সেটা যদি ঠিক পথে চালনা করা যায়, তাহলে ভালই হবে। অন্যদিকে এর পরে এই দল টিকে থাকবে নাকি, সে প্রশ্নটাও উঠে আসে। একটা গাছ অনেক বড় হয়ে যখন সব কিছু ঢেকে দেয়, সে গাছ কাটা পড়ে গেলে তখন ছায়া দেওয়ার জন্য আর কিছু থাকে না। সেটা কিন্তু চিন্তার বিষয় হবে তমালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে"।

সোনালী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, মা বিরক্ত হয়ে বলল, "তোমরা কি এখন এসব নিয়েই আলোচনা করে যাবে? এর থেকে তো মামণকে অন্য কোন বিভাগে দিতে পারত! এই রাজনীতি জিনিসটা আমি বুঝিও না, ভালোও লাগে না"।

সন্দীপ বললেন, "তুমি বা আর পাঁচটা লোক, যারা রাজনীতি বুঝেও বুঝতে চায় না, তাদের জন্যই দেশটার বারোটা বাজছে সেটা বুঝতে পারো কি? সুবিধাবাদী রাজনীতিকরা তো সেটাই চাইবে, মানুষ রাজনীতিটা না বুঝে থাকুক। মানুষ রাজনীতি না বুঝলে তাদের টুপি পরানো অনেক সোজা হয়ে যাবে। তোমাকে রাজনীতি বুঝতেই হবে। না বুঝলে একটা ভুল ভাল সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে এলে সব থেকে বেশি সমস্যায় তুমিই পড়বে। এটা যত তাড়াতাড়ি বুঝবে, তত ভাল"।

মা বলল, "ঠিক আছে, বুঝলাম। এর পর থেকে রাজনীতিটাও বোঝার চেষ্টা করব না হয়। কিন্তু তা বলে আমার মেয়েটা এরকম উল্টো পালটা রাজনীতিবিদদের সঙ্গে ওঠ বোস করবে সেটা ভাল? এর থেকে

সিনেমা টিনেমার খবর করলে ভাল হত না?"
সন্দীপ বললেন, "ভাল মানুষ খারাপ মানুষ সব ক্ষেত্রেই আছে। ক্ষতি করতে পারে বলে ঘরে বসে থাকলে হবে নাকি? সমস্যায় পড়লে সেটা থেকে পালিয়ে না গিয়ে সেটাকে ফেস করতে হবে। তবেই জীবনে কিছু করতে পারবে। বুঝলে?"
মা বলল, "হুহ। আর বুঝে কাজ নেই। চল খেয়ে নেবে"।
সন্দীপ হেসে ফেললেন। সোনালীও।

১১।

জেলা কমিটির মিটিং শুরু হয়েছে। তপন চুপ করে বসে আছেন একটা চেয়ারে।
মিটিং এর আহ্বায়ক অনন্ত সেন বললেন, "আজকের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে দলে থেকেও দল বিরোধী কার্যকলাপের জন্য কিছু পার্টি মেম্বারকে দলে রাখা হবে, না এক্সপেল করা হবে। তার আগে বলি, সকালের খবর সংবাদপত্রে কমরেড তপন রায় সম্পর্কে একটি খবর বেরিয়েছিল। সে খবরের ব্যাপারে কমরেড তপন রায়কে শো কজও করা হয়েছিল। জবাবে কমরেড তপন রায় একটি সাদা কাগজ জমা দিয়েছেন। পার্টি কমরেড তপন রায়ের কাছে জানতে চায়, এই সাদা পাতা জমা দেওয়ার কারণ কী?"
দুয়েকজন তপনের দিকে তাকালেন। তপন ভ্রুক্ষেপ করলেন না। বিনোদ দত্ত গলা কাঁপিয়ে শুরু করলেন, "এই মুহুর্তে আমাদের পার্টি হেরে গেছে। চৌত্রিশ বছর ধরে আমরা যে শক্ত জমির উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম, সে জমিতে ভূমিকম্প হয়ে গেছে। কেন ভূমিকম্প হয়ে গেছে, সে কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, তার এলাকায় তপনবাবু দল বিরোধী কাজে মদত দিয়েছেন। বিরোধীদের সঙ্গে যোগসাজশ রেখে কাজ করে গেছেন। আপনারা সকলেই জানেন, সংবাদমাধ্যমে অবধি প্রকাশ পেয়েছে, প্রমোটার রাজ চালিয়ে তপনবাবু কীভাবে দলের তথা এলাকার ক্ষতি করেছেন। শুধু তাই নয়, তপনবাবু ক্রমাগত সব খানে দলবিরোধী বক্তব্য রেখে গেছেন। উনি বলেছেন, পার্টি মেম্বাররা চাকরি পেয়ে পার্টির প্রতি আনুগত্য কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে নীচু স্তরের পার্টি কর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক যে সময়ে আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর দরকার ছিল কমরেড, ঠিক যে সময় আমাদের ঐক্যবদ্ধ হবার দরকার ছিল কমরেড, সেই সময় তপনবাবু দলবিরোধী মন্তব্য ক্রমাগত করে দলের ক্ষতি করে চলেছেন। এই মুহুর্তে তপনবাবু দলে থাকা মানে আমাদের দলের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যাওয়া। নিচু শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে ঐক্য নষ্ট হয়ে যাওয়া। উচ্চতর নেতৃত্বের কাছে আমার আবেদন, তপনবাবুকে দল থেকে বহিস্কার করা হোক এবং প্রমোটার রাজের সঙ্গে তার যোগসাজশের অভিযোগের উপযুক্ত তদন্ত করা হোক"।
জেলা সভাপতি নিখিল চক্রবর্তী তপনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কাগজে ওপেনলি বলার কী দরকার ছিল তপন? দ্বিতীয়ত, শো কজের জবাবে সাদা পাতা? কেন?"
তপন বললেন, "চিটফান্ডেড মিডিয়ার ভিত্তিহীন অভিযোগের জবাব দিতে হবে আমাকে? সাদা পাতাটা শুধু সে প্রশ্নের প্রতিবাদ ছিল কমরেড। আর কাগজে কী বলেছি? বাস্তবটাকে ফেস করতে হবে বলে বলেছি। এখন আমরা আর সরকারে নেই। সরকারে কবে ফিরব, তাও জানা নেই। সেক্ষেত্রে আমরা আত্মসমালোচনা করতেই পারি। আমাদের কী কী ভুল ছিল, কেন আমরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম, তা নিয়ে যদি আমরা এখন আলোচনা না করি তবে কবে করব?"
নিখিল বললেন, "সব মানলাম কিন্তু সেটা পার্টিতে বললেই তো হত। মিডিয়ায় বলাটা শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ"।
তপন বললেন, "পার্টি যা সিদ্ধান্ত নেবে আমি মেনে নেব। তবে এটাও মনে রাখা উচিত, আমাদের পার্টি অফিস যখন দখল হয়েছিল, তখন এই গলা কাঁপিয়ে বক্তৃতা দেওয়া বিনোদ সেখানে ছিল না। রবির গায়ে হাত পড়েছিল। আমিই সেখানে অফিসটাকে উদ্ধার করি। কোথায় ছিল তারা তখন?"
বিনোদ রেগে গিয়ে বললেন, "মুখ সামলে কথা বলবেন"।
তপন বিরক্ত মুখে বললেন, "কী মুখ সামলাতে হবে হে? রঘুবীরের সঙ্গে তলায় তলায় সাট করে নিজের এলাকার সব ভোট ই এম সিতে ফেলিয়েছো তুমি, তোমার এলাকায় লাস্ট তিন মাসে চারটে পুকুর বুজিয়েছিলে। আমাকে মুখ খোলাবে? বলব সব কিছু?"

বিনোদ তেড়ে আসতে যাচ্ছিলেন, নিখিল হাত তুললেন, “আহ, এটা কি মল্ল যুদ্ধের আখড়া নাকি? দেখো তপন, তুমি যে রঘুবীরকে সেদিন ফোন করে ঠিক কর নি সেটা মানো তো? তার পরিবর্তে আমরা উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে পারতাম!”

তপন বললেন, “কীসের উপযুক্ত সময়? আমার পার্টির লোকই আসে নি সেদিন! আমার তো আর কোন উপায় ছিল না। একবার অফিস দখল হলে সে দখলমুক্ত করা কি অতই সহজ?”

অফিসে চাপান উতোর শুরু হল। একের পর এক জেলা কমিটির মেম্বার পার্টির হারের কারণ দাখিল করলেন। দেখা গেল সকালের খবরের করা বেশ কয়েকটা অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। সবাই তপনের সাদা পাতা জমা দেওয়াটা পার্টি বিরোধী কাজ বলেই মনে করছে।

রাত বারোটা নাগাদ ঠিক হল ভোটাভুটি হবে তপনকে রাখা হবে না বহিস্কার করা হবে তা নিয়ে। রাত একটা পনেরোয় গোপন ব্যালটে ভোটের রেজাল্ট প্রকাশ করা হল।

তপন রায়কে পার্টি বিরোধী কাজের জন্য পার্টি থেকে বহিস্কার করা হল।

১২।

অফিসে ঢুকতেই সোনালীকে কাবেরী ডাকলেন।

সোনালী কৌতূহলী মুখে কাবেরীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, "কী হয়েছে গো?"

কাবেরী বললেন, "তপনদাকে পার্টি থেকে এক্সপেল করা হয়েছে, বেসিকালি তোর ওই রিপোর্টটাকেই অজুহাত করে এক্সপেল করা হয়েছে"।

সোনালী হাঁ করে কাবেরীর দিকে তাকিয়ে বলল, "মানে? তপন রায়কে এক্সপেল করা হয়েছে? এটা সম্ভব?"

কাবেরী বললেন, "লবিবাজি থাকলে সব সম্ভব"।

সোনালী বলল, "কীরকম?"

কাবেরী বললেন, "রাজনীতিতে যখন একই দলে দুটো গোষ্ঠী তৈরী হয়ে যায়, তখন যে গোষ্ঠীতে লোক বেশি থাকে, অন্য গোষ্ঠী চেষ্টা করে আরেক গোষ্ঠীকে লেঙ্গি মারতে। দুর্ভাগ্যবশত তপনদার মত লোকেদের বন্ধুর থেকে শত্রু বেশি হয়। দলের ভেতরেই শত্রু বানিয়ে রেখেছিলেন। আমাদের কাগজের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে তপনদাকে শো কজ করা হয়েছিল। তপনদা পার্টিতে সেটার উত্তরে সাদা পাতা জমা দিয়েছিলেন। দলের অধিকাংশ মানুষ তাকে উদ্ধত এবং শো কজের সঠিক উত্তর না দেওয়াকে দল বিরোধী কাজ বলে মনে করেছে। ফলে দল থেকে বের করে দিয়েছে। ক্লিয়ার?"

সোনালী বলল, "একটা লোক, যে কিনা এভাবে পার্টি অফিসটাকে বাঁচালো, তাকে দল থেকেই বের করে দিল?"

কাবেরী বললেন, "এরকম কত লোককে বের করা হয়েছে। বহিস্কার করার পদ্ধতিও একেবারে অগণতান্ত্রিক কিছু না। প্রথমে শো কজ করা হয়। তারপর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সেই শো কজের উত্তর দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তপনবাবু রঘুবীর যাদবের সাহায্যে অফিস খুলিয়েছেন, তথাকথিত জমি কেলেঙ্কারিতে যুক্ত হয়েও কোন রকম উত্তর না দেখিয়ে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন, ব্যস। বের করতে আর কী চাই?"

সোনালী বলল, "ওর পার্টির লোক বুঝবে না ওকে যে দরকার?"

কাবেরী কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "গড নোজ। পনেরো বছরের এম এল এ, এভাবে বের করে দিতে বোধ হয় ওরাই পারে। দেখাবে পার্টির উপরে কেউ নয়। কিন্তু সব কিছুর সময়, অসময় বলে যে কিছু হয়, সেটাও বোঝা উচিত ছিল"।

সোনালী মনমরা হয়ে নিজের ডেস্কে বসল। প্রথমে ভাবল তপনবাবুকে ফোন করবে। তারপর ঠিক করল ফোন না করে সরাসরি দেখা করে আরেকবার সরি বলাটাই ঠিক হবে। তার নামটাও জড়িয়ে আছে এই কেসে। যদি তার রিপোর্টের ভিত্তিতেই এত বড় সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে তার যাওয়া উচিত।

বাড়িতে কাজ আছে বলে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। তপনবাবুর বাড়িটার সামনে যখন পৌঁছল, তখন সাড়ে এগারোটা বাজে। কেউ নেই বাইরেটায়। অদ্ভুত শূন্যতা গ্রাস করে আছে বাড়িটাকে।

কলিং বেল বাজাতে শ্যামলী দরজা খুললেন। তাকে দেখে হাসলেন, "এসো"।

সোনালী বললেন, "স্যার আছেন?"

শ্যামলী বললেন, "হ্যাঁ, বারান্দাতেই আছেন। এসো"।

সোনালী ঢুকল।

তপন কাগজ পড়ছিলেন। তাকে দেখে বললেন, "ওহ, খবরটা পেয়ে এলে বুঝি?"

সোনালী কাঁচুমাচু মুখে বলল, “আমি এক্সট্রিমলি সরি স্যার। সব কিছু এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল আমি কিছু বুঝতেই পারি নি”।
তপন বললেন, “বস বস। অত চিন্তার কিছু নেই। এসব হয়। রাজনীতি এর নাম। সব কি আর বুঝিয়ে বলা সম্ভব? তুমি কি বুঝেছো কী হয়েছে ব্যাপারটা?”
সোনালী বলল, “হ্যাঁ, কাবেরীদি খানিকটা বলেছেন। আপনি শো কজের উত্তরে সাদা পাতা জমা দিয়েছিলেন”।
তপন বললেন, “হ্যাঁ। কমিউনিস্ট পার্টিতে একটা চিট ফান্ডের টাকায় চলা কাগজের খবরের ভিত্তিতে একজন বর্ষীয়ান কমরেডকে যখন শো কজ করা হয়, সেটাই সব থেকে বড় অপরাধ। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম খুব লাফালাফি করব। তারপর ভাবলাম, থাক, বয়স হয়েছে। কী হবে আর?”
সোনালী বলল, “আপনি কি এখন অন্য কোন দল জয়েন করবেন?”
তপন বললেন, “নাহ। আমি এখন অবসরযাপনকে বেছে নিলাম। আমার পক্ষে অন্য কোন দলে গিয়ে রাজনীতি করা সম্ভব না। নিজের সামনে স্ট্রাগলের দিনগুলোকে নষ্ট হতে দেখেছি এত দিন ধরে। এখন আর আমার পক্ষে এই রেজিমেন্টেড পার্টির বাইরে গিয়ে কোন দক্ষিণপন্থী দলে গিয়ে রাজনীতি করা সম্ভব না। কোন দল করব? যেখানেই যাব, এই গোষ্ঠীবাজী আছেই সব খানে। আসলে ব্যাপারটা কী বল তো? সিপিএম তৃনমূল কংগ্রেস বিজেপি না। ব্যাপারটা হল জাতগত। আমরা বাঙালি বলেই আমাদের মধ্যে এত গোষ্ঠীবাজি। এ কাঁকড়ার জাত, একজনকে উঠতে দেখলে কিছুতেই উঠতে দেবে না। পা টেনে ধরবে। সিঙ্গুরের কারখানা দেখে বুঝলে না? এরা যেই বুঝল কারখানা হলে লেফটকে আর কিছুতেই হারানো যাবে না, ব্যস! পা টেনে ধরল। অবশ্য আমাদের দোষ আছে...”।
তপন চুপ করে গেলেন।
সোনালী বলল, “কী দোষ?”
তপন বললেন, “কথাটা আমি অফ দ্য রেকর্ড বলছি। ছাপিয়ে দিও না যেন”।
সোনালী লজ্জিত হয়ে বলল, “না না স্যার, বলুন”।
তপন বললেন, “কঠোর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকলে সিঙ্গুর থেকে টাটারা কিছুতেই যেত না। দিনের পর দিন একটা রাজপথকে আটকে, কারখানার শ্রমিকদের ভয় দেখিয়ে যেখানে শিল্প তাড়ানো হয়, সে রাজ্য আর যাই হোক শিল্প ডিজার্ভ করে না। ওই যে বললাম, বাঙালি কাঁকড়ার জাত। না খেয়ে মরবে, তবু অপর বাঙালির উন্নতি দেখতে পারবে না”।
সোনালী বলল, “শুদ্ধবাবু চেষ্টা করছিলেন কিছুটা”।
তপন মাথা নাড়লেন, “শুধু চেষ্টা করলেই হবে না। শুদ্ধবাবুর সমস্যা হল উনি বড় অভিমানী মানুষ। রাজনীতি করতে এলে ওই সব ইমোশন সরিয়ে রেখে মাঠে নামতে হবে ভাই। ইমোশন কীসের হ্যাঁ? এই তো কাল আমাকে ওরা বের করে দেওয়ার ডিসিশন নিল। আমারই কত লড়াইয়ের সঙ্গী সব। এখন সেই চেনা মুখগুলোই কত অচেনা হয়ে গেছে। তাতে কী হয়েছে? আমার কি কিছু হয়েছে? আমি জানি, আমি যা করেছি ঠিক করেছি। নিজের কাছে পরিষ্কার থাকতে হবে”।
শ্যামলী এসে বললেন, “তুমি দুপুরে খেয়ে যাবে।”
সোনালী বলল, “এ মা, তা কেন?”
শ্যামলী বললেন, “না না, আমি ভাত বসাচ্ছি। খেয়ে যাবে”।
সোনালী নিরূপায় হয়ে বলল, “ঠিক আছে”।
তপন বললেন, “রবি মহারাষ্ট্রে একটা চাকরি পেয়েছিল। চলে যাবে ঠিক করেছে। আমি আর বাধা দিলাম না। জোর করে রেখে লাভ নেই। এ রাজ্যটায় আর কিছু থাকবে না ভবিষ্যতে”।
সোনালী বলল, “আপনি আর স্টেট লেভেলে অ্যাপিল করবেন না?”

তপন বললেন, “কী হবে করে? ভোটের বহু দেরী এখন। পরে দেখা যাবে ওরাই এসে আবার আমার কাছে অ্যাপিল করবে। তার থেকে বাড়িতে বসে না হয় কিছুটা পড়াশুনা সেরে রাখি”।

সোনালী বলল, “আপনার সঙ্গে শুদ্ধবাবুর কথা হয়েছে?”

তপন বললেন, “নাহ। সবাই কেমন বসে গেছে। যেন ভোটে হারলাম মানেই সব শেষ হয়ে গেল। এরকম ম্যাদামারা কমিউনিস্ট পার্টি আমি কখনো দেখি নি। কংগ্রেস আমলে কম মার খেয়েছি? তারপরেও আগুন ছিল শরীরে। মেরে যা, মেরে ফেল, বাঁচিয়ে রাখিস না। যদি বাঁচিয়ে রাখিস, তাহলে তুই বাঁচবি না। এটা ছিল আমাদের মূল মন্ত্র। আর এখন? মারলে বলছে ঘরে ঢুকে বসে থাকো বা আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যাও। ভাবা যায়?”

কথাগুলো বলে তপন বিরক্তিতে পেপারটা ছুঁড়ে বললেন, “বাদ দাও। আর এ আলোচনা ভাল লাগছে না। চল খেয়ে নি”।

১৩।

প্রত্যুষ সাঁতরা সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছেন। বেশ কয়েকজন গেছে তার বাড়ি। সোনালী আর রাজাও গেছে।
মিটিংটা বেশ নাটকীয় ভাবেই শুরু করলেন প্রত্যুষ। বললেন, "এই মুহূর্তে রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। আপনারা সবাই জানেন কী দ্রুত গতিতে কাজ চলছে এই রাজ্যে। চৌত্রিশ বছরের জগদ্দল পাথর ঠেলে যে জোয়ার এসেছে তা অনস্বীকার্য। বামফ্রন্ট অনেক ভুল করেছিল। আমি ঠিক করেছি, এই উন্নয়নের জোয়ারে সামিল হব। আজ আমি দল ত্যাগ করলাম। যাওয়ার সময় মিষ্টি খেয়ে যাবেন"।
দেওয়ালে লেনিনের ফটো জ্বলজ্বল করছে। প্রত্যুষবাবু উঠতে যেতে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, "শাসক দল আপনাকে কি অসিশিয়ালি কোন ইনভিটেশন পাঠিয়েছে?"
প্রত্যুষ বললেন, "হ্যাঁ। ওঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। আমি জানিয়ে দিয়েছি আমি উন্নয়নে সামিল হতে চাই"।
একজন প্রশ্ন করল, "এই সিদ্ধান্তের পিছনে কি কেউ জোর করেছিল? কোন বাহ্যিক শক্তি ইত্যাদি?"
প্রত্যুষ মাথা নাড়লেন, "একবারেই না। আমি স্বেচ্ছায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি"।
সোনালীর কী মনে হল, সে বলে উঠল, "স্যার, তপনবাবুকে পার্টি থেকে এক্সপেল করা হয়েছে, এই ব্যাপারে আপনার কিছু বক্তব্য আছে?"
প্রত্যুষ সোনালীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "না কিছু বক্তব্য নেই। উনি যদি আমার পথের শরিক হন তাহলে খুশি হব। পার্টিতে কিছুই পড়ে নেই আর বেশি কিছু"।
সোনালী বলল, "আপনার মনে হয় তপনবাবুর মত আদর্শবাদী এবং সৎ নেতা আপনার পথ ধরতে পারেন?"
খানিকটা ঘোরের মাথাতেই প্রশ্নটা করে বসেছিল সোনালী। রাজা তার কনুইতে চিমটি কাটল।
প্রত্যুষ গম্ভীর গলায় বললেন, "আপনি কী ইঙ্গিত করছেন? কোন পেপার আপনি?"
সোনালী বলল, "কিছু না স্যার। থ্যাঙ্কিউ"।
প্রত্যুষ রাগী চোখে সোনালীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "সবাই সৎ। এখানে কোন সততার প্রতিযোগিতা চলছে না। বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয়, আশা করি শিখে আসবেন আপনারা"।
রাজা সোনালীকে জোর করে প্রত্যুষের বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে এল।
সোনালী বলল, "কী হল?"
রাজা বলল, "তোর কী হল? মার খাবার ইচ্ছা হয়েছে? প্রত্যুষের লেঠেল বাহিনী কিন্তু সাঙ্ঘাতিক। তাড়াতাড়ি বেরো"।
দুজনে ট্যাক্সি নিল একটা।
সোনালীর অকারণ উত্তেজনা চলে এসেছিল ভেতরে। বলল, "কীরকম ফালতু একটা লোক। এত বছর ধরে একটা রাজনীতি করলি। এখন যাদের এগেইন্সটে এত বছর লড়াই করলি, সেই দলটাতে জয়েন করতে হবে? এত কিসের দাবী জীবনের প্রতি তোদের?"
রাজা ইশারায় সোনালীকে থামাল।
কিছুক্ষণ পর ট্যাক্সি ছেড়ে দিল তারা। একটা চায়ের দোকানে চা নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে রাজা বলল, "তুই এরকম ইমপালসিভ হয়ে যাস না। প্রত্যুষ সাঁতরা যদি দিলীপকে বলে দেয় তাহলে তোর চাকরি নট হয়ে

যাবে কিন্তু"।
সোনালী বলল, "ঝাঁটা মারি অমন চাকরির মুখে শালা। করব না এরকম চাকরি। একটা কথা বলা যাবে না, আমার নাম নিয়ে একটা ভুল ভাল রিপোর্ট লিখে দেবে, দাস খত লিখে দিয়েছি নাকি রে? বল না! কী অদ্ভুত তো! কিছুই বলতে পারব না? তাহলে পাঠিয়েছে কেন প্রেস কনফারেন্সে?"
রাজা বলল, "ঠিক আছে ভাই, তুই শান্ত হ। তোর তপনবাবুর কাছে যাওয়া উচিত হয় নি। ওরকম আইডিয়াল লোকের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সবাই তপনবাবুর মত হয় না এটা তোকে মেনে নিতে হবে"।
সোনালী রাগে গুমরাচ্ছিল। বলল, "আমি বুঝেছি প্রত্যুষ সাঁতরা কেন পালটি মারছে। বুঝলি না? একগাদা বে আইনি সম্পত্তি করেছিল তো। আগের দলে থাকলে সব বেহাত হয়ে যাবে তো। তাই পালটি"।
রাজা হাসল, "সবই তো বুঝিস। দেখ সোনালী, তুই জারনালিজমের বেসিক ব্যাপারটা ভুলে যাচ্ছিস। তুই বায়াসড হয়ে যাচ্ছিস। বায়াসড হলে কী করে হবে বল তো? তোকে নির্লিপ্ত হতে হবে। চুপচাপ যাবি, যা ঘটছে নোটডাউন করবি, অফিস ফিরে রিপোর্ট দিয়ে বাড়ি চলে যাবি। ব্যস। এই ব্যাপারটাকে এত সিরিয়াসলি নিয়ে নিচ্ছিস কেন?"
সোনালী বলল, "জানি না কেন সিরিয়াসলি নিচ্ছি। যত চারদিকটা দেখছি, রাগ হয়ে যাচ্ছে। তপনবাবুর মত পার্টি অন্ত প্রাণ লোককে ভিত্তিহীন অজুহাতে বের করে দিচ্ছে, প্রত্যুষবাবুর মত লোকেরা মনের সুখে জার্সি পাল্টাচ্ছে, চারদিকটা এরকম হয়ে যাচ্ছে কেন বল তো? কেন একজন মানুষও থাকবে না, যাকে দেখে আমরা ইন্সপায়ারড হব?"
রাজা বলল, "আছে তো। তপন রায়"!
সোনালী বলল, "তারপর? তপনবাবুর পরে কাকে দেখে ইন্সপায়ারড হবি?"
রাজা হাসল, "ঠিক উঠে আসবে একজন। আসতেই হবে। অত চাপ নিস না"।
সোনালী বলল, "ধুস"!

১৪।

তাদের সবাইকে ডেকেছিলেন দিলীপ।
তারা সবাই বসতেই জ্যান্তব উল্লাসে বলে উঠলেন, "একটা উইকেট পড়ল। প্রত্যুষ সাঁতরা। জাস্ট দুটো রিপোর্ট নামতেই প্রত্যুষ দল পাল্টানোর জন্য হাকু পাকু করে উঠেছে। পাইপ লাইনে আরো দুটো মাগুর মাছ আছে। আহা, কমরেড, কত বড় বড় পড়াশুনা করা কমরেড। কী দশা তোমাদের! প্যান্টুল হলুদ হয়ে খুলে যাচ্ছে। কোনভাবে খড়কুটোর মত ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য, আপোষ করে ফেলছো লেনিন পড়া কমরেড! সোনালী!"
দিলীপ সোনালীর দিকে তাকালেন।
সোনালী বলল, "হ্যাঁ স্যার"!
দিলীপ বললেন, "আমি ভেবেছিলাম তুমিই বের করে আনবে খবরটা। একবারে মাটি খুঁড়ে বের করে আনবে। পারলে না"।
সোনালী বিস্মিত হয়ে কাবেরীর দিকে তাকাল। কাবেরী যেন সোনালীর হয়েই প্রশ্নটা করল, "কী বের করে আনবে?"
দিলীপ বললেন, "তপন রায়ের ছেলের শুভায়ুর ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করতে বল সোনালীকে। ও ছেলে দিল্লিতে কেন গেছে?"
সোনালী বলল, "চাকরি করতে?"
দিলীপ রহস্যের হাসি হেসে বললেন, "চাকরি করতে গেছে? এটুকুই জেনেছো? আর কিছু জানো নি?"
সোনালী বলল, "না। আর তো কিছু বলে নি। ও হ্যাঁ, এটা শুনেছি, ছেলে বাবার সঙ্গে কী নিয়ে মন কষাকষি হয়েছে, ছেলে চায় বাবা দিল্লিতে গিয়ে তার কাছে থাক, বাবা এখানেই থাকতে চান"।
দিলীপ বললেন, "কিছুই জানো নি তাহলে। ও ছেলে একটি যন্তর। কলেজে পড়াকালীন ওর ছেলের নামে একটা কেস উঠেছিল। খবর নাও। নিউজ কর। তপন রায় মাথা নোয়াতে বাধ্য হবে"।
সোনালী বলল, "আর মাথা নোয়ানোর বাকি আছে কি কিছু? উনি অলরেডি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন"।
দিলীপ বললেন, "তাতে কী হয়? বহিষ্কৃত হলেই বা কী? প্রত্যুষের মত দল পাল্টেছে কি? তা তো না। এখনো নিজের দেমাকেই আছে। ওর ছেলের কেসটা মাটি খুঁড়ে বের কর। যা সাহায্য লাগে আমি দেব। দেখি পারো নাকি"।
সোনালী ঘাড় নাড়ল, "ঠিক আছে"।
মিটিং শেষ হলে সোনালী কাবেরীর কাছে গিয়ে বলল, "কী ব্যাপার কাবেরীদি? তপন রায়ের ছেলের আবার কী কেস?"
কাবেরী মাথা নেড়ে বিরক্ত মুখে বললেন, "সেই হিন্দিতে কথা আছে না হাত ধোকে পিছে পড়া হে, বসের হয়েছে সেই হাল। কিছু না কিছু একটা বের করেই ছাড়বে"।
সোনালী বলল, "হ্যাঁ সে না হয় বুঝলাম। তপনবাবুর ছেলে শুভায়ুর ব্যাপারে কাকে জিজ্ঞেস করব? তপনবাবুকেই জিজ্ঞেস করব?"
কাবেরী বললেন, "তুই কি গাধা? যার ব্যাপারে কেচ্ছা ঘাঁটতে নেমেছিস, তাকেই সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায়? এক কাজ কর, তুই তপনবাবুর অপোনেন্ট লবির কাউকে জিজ্ঞেস কর"।
সোনালী ঠোঁট কামড়ে বলল, "অপোনেন্ট লবি বলতে কে? বিনোদ দত্ত?"

কাবেরী বললেন, “হ্যাঁ। এই তো বুদ্ধি খুলেছে”।
সোনালী বলল, “নাম্বার আছে?”
কাবেরী নাম্বার বের করে দিলেন। সোনালী ফোন করল।
বিনোদ ফোন ধরে সোনালী পরিচয় দিয়ে বলল, “স্যার আপনার সঙ্গে একটা ইম্পরট্যান্ট ব্যাপারে কথা ছিল। কথা বলা যাবে?”
বিনোদ বললেন, “হ্যাঁ বলুন”।
সোনালী বলল, “আমি সকালের খবর থেকে বলছি”।
বিনোদ বললেন, “ওহ দিলীপবাবুর কাগজ। বলুন”।
সোনালী বলল, “অ্যাকচুয়ালি স্যার তপন রায়ের ছেলে শুভায়ু রায়ের সম্পর্কে কিছু তথ্য জানার ছিল। উনি কেন দিল্লিতে গেছেন, সে ব্যাপারে যদি কিছু বলেন...”
বিনোদ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে সন্দিগ্ধ গলায় বললেন, “কেন বলুন তো? আমিই কেন?”
সোনালী বলল, “আসলে স্যার দিলীপবাবু আপনাকে খুব ভরসা করেন। উনিই বললেন, অথেন্টিক খবর পেতে হলে আপনাকেই ফোন করতে”।
বিনোদ এবার খুশি হলেন, “তা ঠিক, দিলীপবাবুও পুরনো লোক। উনি তো আমাকে চিনবেই। শুনুন, আপনাকে আমি কংক্রিট খবর দিতে পারব না। তবে তপনের ছেলে শুভায়ু কলেজে একটা সেক্সুয়াল অ্যাসল্টে জড়িয়ে পড়েছিল। তপন সে কেস ধামাচাপা দিয়ে ছেলেকে দিল্লি পাঠিয়ে দেয়। সে সময় মিডিয়ার এত হইচই ছিল না, সোশ্যাল মিডিয়াও এত সক্রিয় ছিল না, বুঝতেই পারছেন তো”...
বিনোদ হে হে করে হেসে ফোনটা রেখে দিলেন।
সোনালী স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল।
তপনও ছেলেকে বাঁচাতে...?
আর পাঁচ জনের মতই?

১৫।

সমীর সিগারেটে টান দিয়ে বলল, "এই যে জেলা টেলা থেকে ছেলে মেয়েগুলো পড়তে আসে কলকাতা শহরে, আমাদের শহুরে ছেলেগুলোর হাব ভাব দেখে কিছু মেয়ে একেবারে লটকে যায়। এলোমেলো চুল, গীটার, মুখে লেনিন, চোরাগুপ্তা বিপ্লবের বুলি... আর কি চাই বল তো ইম্প্রেস হবার জন্য?"

অফিসের বাইরে তারা চা খেতে গেছিল। কলেজ লাইফ নিয়েই কথা হচ্ছিল। সমীরের কথাটা শুনে সোনালীর মনে পড়ল তাদের কলেজেও একটা ছেলে ছিল প্রিয়ম বলে। সবাই প্রিয়ম বলতে অজ্ঞান। প্রিয়ম দারুণ ইংরেজি বলে, প্রিয়ম খুব ভাল বক্তা, গান গাইতে পারে। মেয়েরা প্রিয়মের জন্য পাগল।

সোনালীর মনে পড়ল তপনবাবুর বাড়িতে অনেকগুলো ছবি ছিল। ছেলের ছবি তো দেখা হয় নি। অথচ এক মাত্র ছেলে। এ কথাটা তার মাথাতেও আসে নি। একটা লোক এতটাই পার্টি অন্ত প্রাণ হবেন যে নিজের ছেলেকেই ভুলে যাবেন? তা তো হয় না। নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে।

আর বিনোদ দত্ত একটা কথা খুব ঠিক ঠাক বলেছেন। তিন চার বছর আগেও সোশ্যাল মিডিয়া এত সক্রিয় ছিল না। ইদানীং সোশ্যাল মিডিয়ার বাড় বাড়ন্ত হয়েছে। তখনকার খবর আর এখনকার খবরের মধ্যে পার্থক্য আছে অনেক। এখন যা ঘটে, সোশ্যাল মিডিয়ায় তার তিন থেকে চার গুণ বেশি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। নন্দীগ্রাম কান্ডটাই যদি আশির দশকে ঘটত, সেক্ষেত্রে এত হইচই হত না। সবটাই কালের নিয়মে চলে এখন। মিডিয়ার পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া শক্তিশালী হয়ে গেছে।

তপনবাবুর বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই। ছেলের বয়স যদি তিরিশও হয়, তাহলে কয়েক বছর আগে ঘটনাটা ঘটার কথা। কোত্থেকে জানা যাবে?

রাজা বলল, "ভাই এটা তো বুঝলাম এসব ছেলেরা মেয়েদের খুব ভাল ইম্প্রেস করতে পারে। ইমপ্রেস হওয়ার পরে কী হয় সেটা নিয়ে কিছু বলবি না?"

সমীর হাসতে হাসতে বলল, "ইনভিটেশন টু ভ্যাকান্ট ফ্ল্যাটস এন্ড দেন..."

সবাই বাজেভাবে হেসে উঠল।

সোনালী বলল, "দেখ সমীর, তোরা তো লেফটের অনেক নিউজই করছিস। আমাকে একটা হেল্প করতে হবে"।

সমীর বলল, "বল"।

সোনালী বলল, "তপন রায়ের ছেলের কী কেস ছিল বের করতে হবে"।

সমীর বলল, "ওহ, ওই যে দিলীপদা বার বার জোর দিচ্ছিলেন ছেলের ব্যাপারে সেটা?"

সোনালী বলল, "হ্যাঁ"।

সমীর বলল, "আর কী হবে? ফাঁকা ফ্ল্যাটে এসবই হবে! বাপ ক্ষমতাসীন বিধায়ক, ছেলে নেতাগিরি করে দু চারটে মেয়েকে নিয়ে কিছু করেছিল আর কী। ও বেরোতে কতক্ষণ? আজ রাতের মধ্যে জেনে যাবি। এখন কি এই নিউজটা করবি ভাবছিস?"

সোনালী বলল, "জানি না আমি কী করব। জানি অন্তত কী ব্যাপার! সেটা তো জানতে হবে, তাই না?"

সমীর বলল, "জানলে নিউজও করতে হবে। আমার মনে হয় আগের কেসে তুই একটু রেগে গেছিস জেনে দিলীপদা এই নিউজটা তোর নামে না চালিয়ে তোকে ইনভলভ করতে চাইছেন। তুইও খানিকটা জানলি, নিউজটা তোর নামে বেরোলে তুইও তখন আর অস্বীকার করতে পারবি না, ব্যাপারটা বুঝেছিস তো?"

সোনালী বলল, "সবই বুঝেছি। ভয়ংকর লোক"।

সমীর বলল, “তা বটে। আমাদের যে আর কী কী করাবে। এক নেতার নামে স্টিং করতে বলল, জোর করে তার হাতে টাকা দিয়ে ব্রেকিং নিউজ করে দিল। অথচ সে লোকের মত সৎ লোক খুব কম আছে। তাকে পার্টি থেকেও বহিস্কার করা হয়েছিল, জানিস তো কে করেছিল খবরটা?”
সোনালী বলল, “কে?”
সমীর বলল, “শাসক দলের এক নেতা। সে নাকি সাংবাদিকও। এ দেশে সব সম্ভব। ভাল্লাগে না আর। অন্য কিছু পেলে সেটা করতাম। ভাবছি ভবতারিণীর সরাসরি ডিলারশিপ নিয়ে নেব। ওটাই ভাল হবে। আমার এক বন্ধু হু হু করে বড়লোক হয়ে যাচ্ছে”।
সোনালী চুপ করে রইল। তার আর কিছু বলতে ভাল লাগছিল না।

১৬।

রাত ন'টা। সোনালী তার ঘরে আলো নিভিয়ে শুয়ে ছিল। মাইগ্রেনের ব্যথা এলে এভাবেই শুয়ে থাকে সে। ফোন বাজতে শুরু করল তার।
দেখল সমীর ফোন করছে। ধরল সোনালী, "হু, বল"।
সমীর বলল, "কী খাওয়াবি বল। বিরিয়ানি?"
সোনালী বলল, "খাওয়াব। নিউজটা পেলি?"
সমীর বলল, "হ্যাঁ, এক্কেবারে জেনুইন খবর এনেছি। শুভায়ু রায়, মেধাবী ছাত্র ছিল। দু হাজার ছয় নাগাদ কলেজের লাস্ট ইয়ারে তার নাম জড়ায় এক মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটার নাম, ধাম সব পেয়ে গেছি। তোকে এস এম এস করছি। মেয়েটার ঠাকুরনগরে বাড়ি। এখন বিয়ে হয়েছে বিরাটিতে। দেখ যোগাযোগ করে পুরনো খবর যদি বের করে আনতে পারিস, দারুণ ব্যাপার হবে। বস আনন্দে হয়ত তোকে ডবল প্রমোশনও দিয়ে দিতে পারে"।
সোনালী বলল, "যাহ, মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে? এখন কিছু বলতে অস্বীকার করে যদি? শ্বশুরবাড়িতে থেকে এসব কেসে সামনে আসতে চাইবেই বা কেন?"
সমীর বলল, "ভাই তুই ডিটেলস চেয়েছিলি। আমি তোকে পাঠাচ্ছি। এর পরে তুই কী করবি নিজে দেখে নে। যতটা আমার পক্ষে করা সম্ভব, আমি করেছি। আর বলিস না"।
সোনালী বলল, "আচ্ছা, থ্যাঙ্কু রে, পাঠিয়ে দে"।
সমীর ফোন রাখার মিনিট খানেকের মধ্যেই মেসেজ পাঠিয়ে দিল।
মেয়েটির নাম অঞ্জনা ভট্টাচার্য। ঠিকানা, ফোন নাম্বার দুটোই দেওয়া আছে।
সোনালী চুপ করে বসে ভাবল কী করে মেয়েটার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। কিছুক্ষণ পর সমীরের দেওয়া নাম্বারে ফোন করল। ফোন বাজতে ওপাশ থেকে এক পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল, "হ্যালো"।
সোনালী বলল, "অঞ্জনা আছে?"
"কে বলছেন?"
"আমি ওর কলেজের বন্ধু। আপনি চিনবেন না। একটু দেবেন?"
"ধরুন"।
কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর এক মহিলা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "বলুন"।
সোনালী বলল, "অঞ্জনা বলছেন?"
"বলছি"।
সোনালী গড়গড় করে বলল, "শুভায়ু রায়ের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলার ছিল। বলা যাবে?"
ফোনটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল।
সোনালী বুঝল সে একটা ব্লান্ডার করে ফেলেছে। কোন ভুল করলে নিজের গালে চড় মারা তার বহুদিনের অভ্যাস। সেটাই করল সে। শুরুতেই নাম বলতে গেল কেন সে? কোন সেক্সুয়াল অফেন্ডারের হঠাৎ করে নাম শুনলে কোন মেয়ে স্থির থাকতে পারে? তার উপরে অঞ্জনা এখন শ্বশুরবাড়িতে আছে। ছি ছি ছি, নিজের ওপরেই লজ্জা হচ্ছিল সোনালীর। এত বড় ভুল সে করতে পারল?
মা ঘরে এসে বলল, "রাতে কী খাবি?"

সোনালী বলল, "যা খুশি। ভাল্লাগছে না ধুস"।
মা বলল, "কেন? কী হল আবার?"
সোনালী বলল, "ও কিছু না, তুমি বুঝবে না"।
মা গজগজ করতে লাগল, "হ্যাঁ, আমি তো কিছুই বুঝব না। সব তুই আর তোর বাবা বুঝবি। সংসারে পড়ে আছি তোদের রান্না করে দেওয়ার জন্য শুধু"।
সোনালী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় তার ফোন বেজে উঠল। দেখল আননোন নাম্বার থেকে ফোন এসেছে। সোনালী ফোনটা ধরতেই ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল, "বলুন। ওটা আমার হাজব্যান্ডের নাম্বার। করলে এটায় করবেন"।
সোনালীর ধড়ে প্রাণ এল। বলল, "অঞ্জনা বলছেন?"
অঞ্জনা বলল, "হ্যাঁ"।
সোনালী বলল, "শুভায়ুর ব্যাপারে কিছু ইনফরমেশন দরকার ছিল। আমরা মুখোমুখি বসে কথা বলতে পারি?"
অঞ্জনা বলল, "কে বলুন তো আপনি? আমাদের কলেজের কেউ?"
সোনালী হাসল, "না না। আমি একজন সাংবাদিক"।
অঞ্জনা শিউরে উঠে বলল, "ওরে বাবা, সেক্ষেত্রে খুব সমস্যা হয়ে যাবে আমার শ্বশুরবাড়ির লোক জানতে পারলে"।
সোনালী বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। গোটা ব্যাপারটাই এমনভাবে খবর করা হবে, আপনার নাম কিংবা ঠিকানা কোনটাই সামনে আসবে না, অথচ সব টুকুই জানা যাবে। আপনি প্লিজ একবার আমার সঙ্গে দেখা করুন"।
অঞ্জনা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "আপনি ঠিক বলছেন তো?"
সোনালী বলল, "হ্যাঁ, আমি ঠিক বলছি"।
অঞ্জনা বলল, "আপনি কাল গৌরী কালিবাড়ির সামনে চলে আসুন দুপুর একটা নাগাদ। আমি বেশিক্ষণ থাকব না, ঠিক আছে?"
সোনালী বলল, "তাই হবে। আপনি আসবেন, এটা শিওর তো?"
অঞ্জনা বলল, "যদি না আসতে পারি আপনাকে ফোন করে নেব, এখন অবধি কোন অসুবিধে হবে না"।
সোনালী "ঠিক আছে" বলে ফোন রাখল।
একটা মেয়ে আর একটা ছেলেতে কতটা পার্থক্য! একজনের সঙ্গে কথা বলবে, তাতেও কত লুকোছাপা!
সোনালী ভাবল একবার অঞ্জনার কথাটা কাবেরীদিকে জানাবে, পরমুহূর্তে সে প্ল্যান ক্যান্সেল করল। ঠিক করল আগে দেখা করে নিয়ে তারপর জানাবে।
তপন আর শ্যামলীর মুখটাও মনে পড়ছিল তার। যেটুকু বোঝা যাচ্ছে, কলেজ লাইফে তাদের ছেলে শুভায়ু অঞ্জনার সঙ্গে এমন কিছু করেছিল যেটা তপনবাবু ধামাচাপা দিয়েছিলেন। বাবা যতই আদর্শবান হোন না কেন, ছেলেকে নিয়ে সমস্যায় পড়তেই পারেন, আর সেক্ষেত্রে তপনবাবুর ভূমিকা যদি ভাল না থাকে, তখন যেটুকু সম্মান ভদ্রলোক তার থেকে আদায় করে নিয়েছিলেন, তার থেকে অনেক বেশি ঘেন্না ফেরত পাবেন। মুখে বড় বড় আদর্শের বুলি মেরে বাস্তব জীবনে আদৌ সেই আদর্শকে মেনে চলতে পারার থেকে কঠিন কাজ আর কিছু হতে পারে না।

১৭।

বাসের ঝামেলায় সোনালীর পৌঁছতে দেরী হয়ে গেছিল।
যখন পৌছল তখন দুপুর একটা কুড়ি বাজে। ফোন বের করে অঞ্জনাকে ফোন করতে সে দেখল একজন ছোট খাট চেহারার মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে মন্দিরের সামনে থেকে।
সোনালী বুঝল এই মেয়েটিই অঞ্জনা।
সোনালী তার পরিচয় দিল।
অঞ্জনা বলল, "আমি বুঝেছি আপনিই হবেন। আমি ও বাড়িতে বলে এসেছি পুজো দিতে যাচ্ছি"।
সোনালী বলল, "ঠিক আছে, আমি সরাসরি কাজের কথাতেই আসি। আমাকে বলুন, শুভায়ু রায়ের সঙ্গে আপনার ঠিক কী হয়েছিল?"
অঞ্জনা বলল, "এই নিউজটা আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন, জানতে পারি?"
সোনালী বলল, "আমাদের এডিটর বলেছেন। তপনবাবু সম্পর্কে একটা রিপোর্ট করতে গিয়েই জানতে পেরেছিলাম আর কী"।
অঞ্জনা কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে তো কিছু বলা সম্ভব না। যদি কোথাও বসা যেত"।
সোনালী একটু ভেবে বলল, "মধ্যমগ্রামে আমার এক মাসীর বাড়ি আছে। আপনার কোন অসুবিধা না থাকলে যেতে পারি"।
অঞ্জনা মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে। বিকেলের মধ্যে আমি বেরিয়ে যাব কিন্তু"।
সোনালী বলল, "আচ্ছা, তাই হবে। চলুন"।
ট্যাক্সি নিল সোনালী। চন্দনা মাসীর বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে দুটো বাজল। মাসী দরজা খুলে তাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "কীরে সোনা, তুই কোত্থেকে এলি? আর এলি, তাও এত দিন পর? ফোন করে আসবি তো? কিছুই তো রান্না করি নি"।
চন্দনামাসী একাই থাকে এত বড় বাড়িতে। মাসীর একমাত্র ছেলে তাতানদা আমেরিকায় থাকে। সোনালী মাঝে মাঝে আসে বটে, কিন্তু কাজের জন্য বেশি আসা হয়ে ওঠে না।
সে বলল, "একটা জরুরি দরকারে এসেছি মাসী। ওর নাম অঞ্জনা। ওর সঙ্গে কিছু কথা আছে। আমরা দুজনেই খেয়ে এসেছি। বেশি জ্বালাব না। ওর সঙ্গে কথা বলে ওকে ছেড়ে দিয়ে তারপর তোমার সঙ্গে আড্ডা মারব"।
মাসী বলল, "আয় আয়। তোরা তাতানের ঘরেই বস তাহলে।
সোনালী অঞ্জনাকে নিয়ে তাতানদার ঘরে ঢুকে ফ্যান চালিয়ে বলল, "গরমও পড়েছে। আপনি কমফোর্টেবল তো?"
অঞ্জনা মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, কমফোর্টেবল। আর আপনি না বলে তুমি বললেও আপত্তি নেই"।
সোনালী একটা জলের বোতল নিয়ে এসে অঞ্জনাকে দিয়ে বলল, "জল খেয়ে নাও একটু। আমি খুব আগ্রহী তোমার ঘটনাটা জানতে। বেসিকালি আমি তপনবাবুকে নিয়ে খুবই ইমপ্রেসড ছিলাম। ভদ্রলোকের কথা বার্তা, কঠিন বিপদেও স্থির থাকার ক্ষমতা, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ভীষণ ভাল। সেখানে... আচ্ছা আপনার কোন সন্তান হয়েছে?"

অঞ্জনা চুপ করে সোনালীর কথা শুনছিল। প্রশ্নটা শুনে বলল, "না। আমার আর আমার স্বামীর মধ্যে বিয়ের পর থেকেই কোন সম্পর্ক নেই। শুভায়ুদার ব্যাপারটা জানার পরে ও আর আমাকে ছোঁয় না। জানতে পারত না, কোন শুভানুধ্যায়ী বিয়ের দিন ওকে জানিয়ে দিয়েছিল আর কী। তাও কপাল ভাল বিয়েটা হয়েছিল। আমার বাবার সম্মান বেঁচেছিল"।

ম্লান হাসল অঞ্জনা।

সোনালী অবাক হয়ে বলল, "শুভানুধ্যায়ী মানে? তোমারই কোন বন্ধু?"

অঞ্জনা বলল, "বন্ধু বলে কি কিছু হয়? হয় না বোধ হয় আজকালকার দিনে। বন্ধু তো আমাদের ছোটবেলায় ছিল যারা কোন স্বার্থ ছাড়াই সাহায্য করতে চলে আসত। এখন যাদের আমরা বন্ধু নামে চিনি তারা বন্ধু না ঠিক। সুযোগ বুঝে পিছনে ছুরি মেরে মজা দেখাই তাদের কাজ"।

সোনালী মাথা নাড়ল, "সেটা তুমি ঠিক বলেছো। তুমি বললে তোমার সঙ্গে তোমার স্বামীর কোন রিলেশন নেই। তাহলে ও বাড়িতে আছো কেন?"

অঞ্জনা বলল, "কোথায় যাব? বিয়ে মানেই তো বেড়াল পার। আর আমার হাজব্যান্ড এমনিতে আমাকে ছোঁয় না ঠিকই, তবে ও সাপোর্টিভ। ও বাড়িতে থাকতে দিয়েছে, আত্মীয় স্বজনকে বউ বলে পরিচয় দিচ্ছে, সেটাই বা কম কী বল?"

সোনালী বলল, "তুমি ইঞ্জিনিয়ার?"

অঞ্জনা বলল, "হ্যাঁ"।

সোনালী বলল, "তোমার কখনো মনে হয় নি, এত সমস্যা না করে চাকরি করি, নিজের পায়ে দাঁড়াই?"

অঞ্জনা মাথা নিচু করে হাতের নখ দেখতে দেখতে বলল, "কিছু করার ছিল না আমার পক্ষে সেই পরিস্থিতিতে"।

সোনালী আগ্রহী গলায় বলল, "আমাকে বলবে সবটা? একদম শুরু থেকে?"

অঞ্জনা বলল, "বলব। কিন্তু আমার পরিচয় এতদিন পরে আর যেন বাইরে না আসে সেটাই চাইব। আমার বাবা..."

সোনালী বলল, "ঠিক আছে। তুমি নিশ্চিন্তে আমাকে বল। আমি শুনব"।

১৮।

।।পূর্ব কথা।।

“কীরে ভাই, তুই পার্টি মেম্বার হবি নাকি বাবার মত?”

শুভায়ু ইউনিভার্সিটির মাঠে পায়ের উপর পা তুলে আকাশ দেখছিল।

প্রীতমের কথাটা কানে যেতে বলল, “পার্টি অবশ্যই করব, তবে নেতা হব না। বাবা বলে কমিউনিস্ট পার্টিতে ওভাবে নেতা হওয়া যায় না। নেতার ছেলে মানেই নেতা হবে, এ আবার কী?”

“তো কী হবি?” প্রীতমের গলায় শ্লেষের ছোঁয়া।

“হোলটাইমার হতে পারি। কোন গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে মিশে কাজ করলাম কোনদিন। বা ধর কোন কারখানায় শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে কোন গণ আন্দোলন করলাম”।

প্রীতম জোরে হেসে উঠে বলল, “থাক ভাই। আর মজা করতে হবে না।”

শুভায়ু উঠে বসল সিরিয়াস মুখে, “মজা মানে? এখানে মজার কী দেখলি তুই?”

প্রীতম বলল, “মানে তুই সিরিয়াস? ইঞ্জিনিয়ারিং করা এম এল এর ছেলে মন্ত্রী হবার অ্যাম্বিশন না নিয়ে তুই কিনা হোল টাইমার হবি? ছ্যা ছ্যা ভাই”।

শুভায়ু বলল, “ছ্যা ছ্যা করার তো কিছু নেই। বরং কমিউনিস্ট পার্টি মানে মানুষের পাশে থাকা। তাদের সমস্যাগুলোকে বোঝা। এই যে সব কিছুকে নিয়ে তোরা ইয়ার্কি মারিস, তাহলে স্টুডেন্ট ইউনিয়ন করছিস কেন?”

প্রীতম বলল, “সত্যি কথা বলব ভাই? ইউনিয়নটা অত কিছু বুঝে করি না। তোদের সঙ্গে থাকতে ভাল লাগে, তাই ঢুকে গেছিলাম। আমার বরাবরই ইচ্ছা একটা ভাল চাকরি করে সেটল হওয়া। আমাদের ফ্যামিলি না হলে ভেসে যাবে।”

শুভায়ু বলল, “মিডল ক্লাস সেন্টিমেন্ট তাই না? সেভাবে দেখতে গেলে আমি চাকরি না করলে আমার ফ্যামিলিও ভেসে যাবে”।

প্রীতম হো হো করে হেসে বলল, “ থাম ভাই, তোর বাবা যা রেখে যাবেন, তা তোর চোদ্দগুষ্টি বসে বসে খাবে”।

শুভায়ু ফিক করে হেসে দিয়ে বলল, “তাই নাকি? এসব ভাবিস তোরা? একজন এম এল এ কত মাইনে পায় জানিস? তার উপর বাবা ছিল রাইটার্সের ক্লার্ক। যখন চাকরি ছাড়ল পার্টির ডাকে, তখন কত আর সেভিংস ছিল? কোনমতে বাড়িটা হয়েছে, সেটাও হত না মা না থাকলে”।

প্রীতম চোখ মারল, “আর তার বাইরে?”

শুভায়ু বলল, “তুই এক কাজ করিস তো ভাই। আমার বাবাকে ফ্রিতে একটা সিগারেটও দিয়ে দেখিস তো, নেয় নাকি দেখিস। আমাদের তো এই অহংকারটুকুই আছে। সেটাকে ভাঙতে দেবে না কেউই। এর আগের বার যখন ভোটে জিতল, বাজারের এক দোকানদার মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে এসছিল। বাবা তার থেকে মিষ্টির প্যাকেটটা নিল বটে, কিন্তু তার টাকা ধরে দিল। সে লোকের চেহারাটা যদি দেখতি”।

শুভায়ুর মুখে গর্বের হাসি।

প্রীতম বলল, “শোন না ভাই, তোকে কোন দিন কোন পাপ করতে হবে না, শুধু কাকুকে বলে আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিস”।

শুভায়ু বলল, "ফালতু কথা বলিস না তো! তোর কাজই হল বাজে কথা বলা। তোর জন্য সুপারিশ লাগবে? এত ভাল পড়াশুনায় শালা, থাম তো"।
প্রীতম বলল, " না রে ভাই, চাকরি না পেলে কী হবে জানি না। যদি না পাই তাহলে তো দেখবি?"
শুভায়ু চিন্তিত মুখে বলল, "বাবাকে বলে হবে না। বাবা কিছুই করবে না তোর। আমি প্রত্যুষকাকুকে বলব। এসব ক্ষেত্রে আমার বাবাকে এপ্রোচ করতে গেলে গম্ভীর মুখে বলবে চেষ্টা করে যাও। নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেয়ে যে পরিতৃপ্তি পাবে, তা আর কিছুতে নেই। হ্যাঁ, কষ্ট হবে, বারবার মনে হবে হেরে যাব, পাব না হয়ত, কিন্তু যেদিন পাবে, বুঝবে নিজের পরিশ্রম সফল হলে কত আনন্দ পাওয়া যায়। আমার বাবা বেসিকালি মহাভারতের চরিত্র বুঝলি তো? এসব লোক থাকলে গর্ব হয় বটে, আবার বিরক্তিও লাগে মাঝে মাঝে। তারপর অবশ্য নিজেই বুঝি, বাবার মতই হতে হবে আমাকে। এ কাম ম্যান উইথ লটস অফ ফায়ার ইন হিস হার্ট"।
প্রীতম ছদ্ম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তাহলে বলতে চাইছিস এম এল এর ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আমার কোন লাভই হল না?"
শুভায়ু হাসল, "বলতে চাইছি না, বলছি। চল একবার ক্যান্টিন থেকে ঢু মেরে আসি"।
দুজনে উঠতে যাচ্ছিল, এই সময় একটা মেয়ে এসে শুভায়ুর দিকে একটা গোলাপ ফুল এগিয়ে দিয়ে বলল, "আই লাভ ইউ"।
শুভায়ু হো হো করে হেসে বলল, " ফার্স্ট ইয়ার?"
মেয়েটা বলল, "হ্যাঁ স্যার"।
শুভায়ু বলল, " কারা পাঠিয়েছে?"
মেয়েটা আঙুল তুলে দেখাতে গিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। যেদিকে দেখাতে গেছিল, এখন সেখানে কেউ নেই। শুভায়ু বলল, "বুঝেছি। নাম কী তোর?"
মেয়েটা বলল, "অঞ্জনা"।
শুভায়ু বলল, " আমাদের এই নদীর নাম অঞ্জনা?"
অঞ্জনা থতমত হয়ে বলল, "মানে?"
শুভায়ু বলল, "সে কী? রবি ঠাকুর পড় নি? চল ক্যান্টিনে গিয়ে চা খেতে খেতে রবি ঠাকুর পড়াই তোমায়"!
অঞ্জনা লজ্জা পেয়ে বলল, "না দাদা, মানে ক্লাস আছে"।
শুভায়ু বলল, "ও হ্যাঁ, ফার্স্ট ইয়ার তো। এখন তোমাদের সব ক্লাস করা দরকার। ঠিক আছে যাও।"
অঞ্জনা চলে গেল দ্রুত পায়ে।
শুভায়ু বলল, "শিওর সৃজাদের কাজ। আমার সাথেই এদের খিল্লি করতে হবে। ঘাড় মটকে দেব দেখ একদিন"।
প্রীতম হাসতে হাসতে বলল, " তা যাই হোক, কাব্যিটা তো ভালই করলি। আবার ক্যান্টিন নিয়ে যাবি বলছিলি। ভাল ভাল"।
শুভায়ু প্রীতমের পেটে খোঁচা মেরে বলল, "ভাট না বকে চল। যত বাজে বকা"।
প্রীতম হাসতে হাসতে শুভায়ুর সঙ্গে ক্যান্টিনের দিকে রওনা দিল।

১৯।

সকাল বেলা। বারান্দায় একগাদা লোক গিজগিজ করছে। কেউ বা সার্টিফিকেট নিতে এসেছে, আবার কেউ এসেছে কোন আবেদন নিয়ে। গৌর সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছিল। তপন ঘরের ভিতর ঢুকে বললেন, "গৌরের জন্য রুটি কোর"।
শ্যামলী বলল, "সে আর বলতে হবে না। করা হয়ে গেছে"।
শুভায়ু ইউনিভার্সিটির জন্য তৈরী হয়ে খেতে বসেছিল। তপন শুভায়ুর সামনে বসে বললেন, "কীরে পড়াশুনা হচ্ছে তো? ইউনিয়ন করলেই হয় না কিন্তু। পড়াশুনোটাও করতে হবে। নইলে ফেল করা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে থাকবি"।
শুভায়ু বলল, "হ্যাঁ, পড়ছি তো। তোমার কী খবর? অ্যাসেম্বলি আছে তো আজ?"
তপন বললেন, "হ্যাঁ সে আছে। কিন্তু তুই কথা ঘুরাচ্ছিস কেন? ইউনিয়ন বেশি হচ্ছে?"
শুভায়ু বলল, "পড়ছি তো। তবে রবিবার হিঙ্গলগঞ্জ যাব"।
তপন ভ্রূ কুঁচকালেন, " কী করতে?"
শুভায়ু বলল, "একটা মেডিকাল ক্যাম্প আছে। পিনাকী, অমিতেশরা যাবে। ওদের সঙ্গে যাব"।
তপন বললেন, " সে যা, কিন্তু বাবান, নেতাগিরি করবি না কিন্তু। নেতার ছেলে মানেই নেতা না"।
শুভায়ু বলল, "হ্যাঁ বাবা, জানি জানি। নেতার ছেলে মানেই নেতা না, নেতা উঠে আসে মানুষের মধ্যে থেকে। যেমন তুমি উঠে এসেছো। সব বুঝেছি"।
তপন বললেন, " মনে রাখবি চিরকাল কাহারো সমান নাহি যায়। আজ আমি এম এল এ আছি, আজ আমাদের পার্টি ক্ষমতায় আছে। কাল নাও থাকতে পারে। তখন কী হবে? আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতই তোকে বড় হতে হবে। বুঝেছিস?"
শুভায়ু বলল, "বুঝেছি বাবা বুঝেছি"।
ডাইনিং রুমে একজন ঢুকে পড়ল, " তপনদা, মিউনিসিপালিটির চাকরির সুপারিশটা করে দিন না দাদা। খেতে পাচ্ছি না বিশ্বাস করুন। যা চাকরি দেবেন, করব"।
তপন লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, "খেয়ে আসো নি? রুটি খাবে?"
লোকটা মাথা নাড়ল।
তপন শ্যামলীকে বললেন, "রুটি দাও একে"। এবার লোকটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি বল, এত চাকরি থাকতে তোমার মিউনিসিপালিটিতেই চাকরি করতে ইচ্ছা হল কেন? কী নাম তোমার"?
লোকটা বলল, "রতন দাদা।"
"কত অবধি পড়েছো?"
"ইতিহাসে অনার্স। এস এস সি দিয়েছিলাম। পেলাম না। এদিকে একটা অস্থায়ী কাজ ছিল, সেটার ভরসায় বিয়ে করলাম। এখন ফ্যামিলি নিয়ে না খেতে পেয়ে মারা যাব প্রায়"।
শ্যামলী রুটি দিয়ে গেলেন।
তপন বললেন, " ঠিক আছে, তুমি খেয়ে নাও। আমি দেখি কী করা যায়। ভ্যাকান্সি তো সেভাবে নেই, এদিকে বেকারত্ব আকাশ ছুঁয়েছে। তবু দেখব। আমি স্নানে যাই। বেরোতে হবে আবার। তুমি কাল একবার এসো। আর গৌরের কাছে নাম্বার দিয়ে যেও"।
তপন উঠল। শুভায়ুরও খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে রান্নাঘরে গিয়ে বলল, "মা হেল্প করব? রুটি করে দেব?"

শ্যামলী বললেন, “না ঠিক আছে। তুই সাবধানে যাবি। আমাকে ফোন করবি গিয়ে। বাস ভাড়া আছে তো?”
শুভায়ু বলল, “আছে। একটা টিউশনি পেয়েছি সন্তোষপুরে। ক্লাস টেন, দুটো সাবজেক্ট, হাজার টাকা দেবে। ভাল না? কলেজ থেকে ফেরার সময় পড়িয়ে ফিরব একেবারে”।
শ্যামলী বললেন, “ তা ঠিক আছে। বেশি রাত করবি না। একে তোর বাবাকে নিয়ে চিন্তায় থাকি। সামনে ভোট আসছে। গ্রামে যাওয়া শুরু করবে। কখন ফিরবে কে জানে”।
শুভায়ু বলল, “বাবা তো গ্রামে যেতে পছন্দ করে। দেখো না বারবার বলে ওটাই আমাদের রুট। আমি তো ভেবেছি এবার আমিও যাব। গ্রাম না জানলে শহর চিনব কী করে?”
শ্যামলী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “যাস। আমার আর কাজ কী তবে? বাড়ি ফেলে রেখে বিবাগী হয়ে যাব”।
শুভায়ু হাসতে হাসতে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, “তা কেন হবে? তাহলে এত রুটি করবে কে?”
শ্যামলী তাড়া দিলেন,”তুই যা তো। আমার পিছনে লাগিস শুধু। পালা”।
শুভায়ু হাসতে হাসতে বেরোল রান্নাঘর থেকে।

২০।

হাউজে পৌঁছোতে দেরী হল তপনের। বিরোধী দলের সৌনক বসু বক্তব্য রাখছিলেন। তপন প্রত্যুষের পাশে বসেন। তাকে দেখে প্রত্যুষ বললেন, "এত দেরী করলি?"

তপন বললেন, "বাড়ি থেকে দেরী হল বেরোতে"।

প্রত্যুষ বললেন, " এখন থেকে ঠিক টাইমে আসার চেষ্টা কর"।

তপন অবাক হয়ে বললেন, "কেন? এ কি স্কুল নাকি?"

প্রত্যুষ বললেন, "স্কুল কেন হবে? শুনছি নেক্সট বার মিনিস্টার হচ্ছিস"।

তপন বললেন, " এসব রটাস না। খিস্তি খাবি"।

প্রত্যুষ বললেন, "রটাতে যাব কেন? খবর জেনুইন। ট্রাভেল সেক্টর ফেইল করে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ওটা তোকে দেবে"।

তপন বললেন, " অ। সে ঠিক আছে, যখন দেবে তখন দেখা যাবে। এসব নিয়ে আমি ভাবি না।"

প্রত্যুষ বললেন, "সে তুই না ভাবলেও আমি ভাবি। নিজেদের লোক থাকলে অনেক লাভ আছে"।

তপন বললেন, " নিজেদের সরকার চলছে, তাই কি যথেষ্ট না? যাক গে, বাবান হিঙ্গলগঞ্জ যাচ্ছে মেডিক্যাল ক্যাম্প করতে। বলেছে তোকে?"

প্রত্যুষ বললেন, "না এখনও কিছু বলে নি। বলবে মে বি। স্টুডেন্ট ফেডারেশনের সব কিছু ও একবার আমাকে বলে নেয়। বাবানের পোটেনশিয়াল আছে। একদিন বাবান পার্টির হাল ধরবে"।

তপন বললেন, "ঘরে বসে আর কলেজ গিয়ে এসে, শখের দুটো মেডিক্যাল ক্যাম্পে এদিক সেদিক গিয়ে পার্টির হাল ধরবে? তোরা পার্টিটাকে আজকাল কী মনে করিস বল তো? গ্রামে গেল না, মানুষের সঙ্গে মিশল না, আর নেতা হয়ে যাবে? এতই সহজ নাকি কমিউনিস্ট পার্টি করা?"

প্রত্যুষ বললেন, "দিন দিন তুই বড্ড কট্টরপন্থী হয়ে যাচ্ছিস। আমাদের পরের জেনারেশন কি স্ট্রাগলটা দেখেছে? তাদের কি পালিয়ে থাকতে হয়েছে না গুলি খাবার ভয় পেতে হয়েছে? তারা সরাসরি ক্ষমতাটা দেখেছে। তারা তাদের মত করে পার্টিটা করবে। এত সিনিকাল কথা বলিস না"।

সামনে থেকে বিমলদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আস্তে কথা বলতে বললেন। তপন গলা নামিয়ে বললেন, "সিনিকাল কথার কিছু নেই। সব কিছুর সময় আছে বলে আমি মনে করি। নেতার ছেলে মানেই সে জন্ম থেকে নেতা হবে তা কেন? নেতৃত্ব অর্জন করতে হয়। মানুষ কেন মানবে তাকে? বাদ দে, বিমলদা রেগে যাচ্ছেন, হাউজেও মনে হয় আর বেশি কিছু হবে না, আমি মনে একবার রাইটার্স যাব। বেশ কয়েকটা রাস্তার স্যাংশন অর্ডার হয়ে পড়ে আছে। ফাইল একটা টেবিল থেকে আরেকটা টেবিল যাবে, কিন্তু কত দিনে যাবে স্বয়ং মার্কসও জানেন না। শুদ্ধদা সাধে বলেন নি ডু ইট নাও। তাতে কো অর্ডিনেশন কমিটি রেগে গেলেও, ওই ঘুঘুর বাসা না ভাঙলে কিচ্ছু করা যাবে না"।

দুজনে হাউজ থেকে বেরিয়ে বাইরে এলেন।

প্রত্যুষ বললেন, "যা ভাই, যেখানে যাবি যা। সাবধানে যা। শুদ্ধদা সবাইকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন, তুইও আর খেপাস না। তোকে মিনিস্টার হতে হবে মাথায় রাখিস"।

তপন বললেন, " সে মিনিস্টার হলাম, কী না হলাম তাতে কী যায় আসে? তাতে কি এই সিস্টেমটাকে পাল্টাতে পারবো? এখন আমার মনে হয় আবার নতুন করে বিপ্লব শুরু হওয়া দরকার"।

প্রত্যুষ তপনের দিকে ছোট ছোট চোখ করে বললেন, "তাহলে তুই এই ক্ষেত্রে শুদ্ধবাবুর পক্ষে?"

তপন বললেন, “একশো পার্সেন্ট”।
প্রত্যুষ বললেন “ তাহলে কিন্তু কো অর্ডিনেশন কমিটি ক্ষেপবে তোর উপর”।
তপন বললেন, “সত্যিটাকে ধামাচাপা দেওয়া তো সম্ভব না। পার্টি করার নাম করে সকাল এগারোটায় এসে দেড়টায় টেবিল খালি করে একটা ইম্পরট্যান্ট ক্লারিকাল স্টাফ কেটে পড়ল, পাবলিক সমস্যায় পড়ে গেল, এগুলো দেখতে হবে না?”
প্রত্যুষ বললেন, “থাম ভাই। যেভাবে চলছে চলতে দে। চেঞ্জ করতে গেলেই সমস্যায় পড়তে হবে। সময় দে, ই গভর্নেন্স এলে সব ঠিক হয়ে যাবে”।
তপন বললেন, “ ই গভর্নেন্স আরেক সোনার পাথরবাটি। সেটাও তো মানুষেই করবে নাকি রে? বাইরের লোক তো করে দিয়ে যাবে না। নাকি রোবট করবে?”
প্রত্যুষ হেসে ফেললেন, “ঠিক আছে। তুই রাইটার্সে যা। আমি আবার হাউজে ঢুকি। আজ একটা মিটিংও আছে আমাদের কমিটির”।
তপন বললেন, “ ঠিক আছে। তুই বাবানের ব্যাপারটা মাথায় রাখিস। আর ওকে নেতা হবার জন্য কোনরকম ইন্ধন দিবি না”।
প্রত্যুষ বললেন, “ইয়েস কমরেড। আপনি যা বলবেন, তাই হবে”!

২১।

ইউনিয়ন রুমে ঢুকে শুভায়ু দেখল অঞ্জনাকে সবাই ঘিরে ধরে বিভিন্ন প্রশ্ন করছে। অঞ্জনা সেসব প্রশ্নে ভ্যাবাচ্যাকা খাচ্ছে। শুভায়ু বলল, "কীরে, তোরা কি এই মেয়েটাকেই পাস? আগের দিন আমাকে প্রপোজ করতে পাঠিয়ে দিলি? আজ আবার একে নিয়ে পড়েছিস। ইউনিয়ন রুমে কিন্তু এসব অ্যালাউড না"।

মুহূর্তের মধ্যে রুম খালি হয়ে গেল। শুধু অঞ্জনা বসে আছে।

শুভায়ু বলল, "তোর ক্লাস নেই?"

অঞ্জনা বলল, "ক্লাস থেকেই সৃজাদি ডেকে পাঠাল। বলল এল ডির ক্লাস করে নাকি কোন লাভ নেই"।

শুভায়ু বলল, "সবার ক্লাসই করতে হবে। নইলে এটেনডেন্সে কেস খাবি। আগের দিন তোকে তুমি বললাম, তারপর মনে হল জুনিয়রদের কেন তুমি বলছি? জুনিয়রদের তুই বলতে হয়। আমি তোকে তুইই বলব।"

অঞ্জনা মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে"। সে ইউনিয়ন রুমের ছবি দেখতে লাগল। হিঙ্গলগঞ্জে কারা কারা যাবে তার একটা তালিকা বানাবার ছিল। শুভায়ু সেই তালিকা বানাতে বসল। অঞ্জনাকে বলল, "তোর ক্লাস নেই এখন?"

অঞ্জনা বলল, "আবার তিনটে চল্লিশে"।

শুভায়ু বলল,"ও"।

অঞ্জনা বলল, " দাদা, ওই ছবিটা ভগৎ সিং এর?"

শুভায়ু বলল, "হ্যাঁ, ভগৎ সিংকে চিনিস না?"

অঞ্জনা বলল, "হ্যাঁ চিনি তো"।

শুভায়ু বলল, " তোর বাড়ি কোথায় যেন?"

অঞ্জনা বলল, "ঠাকুরনগর"।

শুভায়ু বলল, "বনগাঁর কাছে?"

অঞ্জনা খুশি হল, "তুমি জানো? এখানে যাকেই বলি, সবার একই কথা, সেটা কোথায়? তুমি জানো দেখে ভাল লাগল"।

শুভায়ু বলল, " কেন জানব না? নিজের রাজ্যকে জানাটা সবার আগে দরকার, তারপর তো বাইরের দেশকে জানব। ঠাকুরনগর কোথায়, রাণাঘাট কোথায়, বহরমপুর কোথায়, চিত্তরঞ্জন কোথায়, কাঁথি কোথায়, হুগলী কোথায় জানব না, প্যারিস কোথায় জানলেই হবে? তোর কী মনে হয়? কোনটা জানা বেশি দরকার?"

অঞ্জনা হাসল, "অবশ্যই আগে নিজের রাজ্যকে জানা দরকার"।

শুভায়ু বলল, "এখানে হোস্টেলে থাকছিস?"

অঞ্জনা মাথা নাড়ল।

শুভায়ু বলল, "ভাল করে পড়াশুনা কর। র‍্যাগিং নিয়ে ভয় পাস না। র‍্যাগিংটা দরকার, বুঝেছিস? আমারও র‍্যাগিং হয়েছিল। সব জুনিয়রদেরই হয়। ওই আড় ভাঙার জন্য পুরোটাই। তারপর দেখবি কখন যেন সবার সঙ্গে মিশে গেছিস। আমার বাবা বলে সবার সঙ্গে মিশে না থাকলে কিছুতেই সাচ্চা কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। থাক, তোকে এসব নিয়ে বেশি জ্ঞান দেব না, অর্ধেক বুঝবি না, পরে বেশি বুঝতে গেলে পাগল হয়ে যাবি। ক'টা ছেলে মেয়েই বা ইউনিয়ন করতে এসে এত কঠিন কঠিন বিষয়ে পড়াশুনা করবে?"

অঞ্জনা বলল, "আমার দিদির পলিটিকাল সাইন্স আছে। ওর বইগুলো পড়তে খারাপ লাগে না"।

শুভায়ু পেন রেখে অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই নাকি? তা তোর কোন মতাদর্শ ভাল লাগে?"
অঞ্জনা বলল, "বামপন্থা ভাল লাগে। বামপন্থায় যেভাবে সবাইকে নিয়ে বাঁচার কথা বলা হয়, সেটা ভাল লাগে"।
শুভায়ু খুশি হয়ে বলল, "বাহ, এতদিনে একজনকে অন্তত পেলাম যে বলল না যে আমি রাজনীতি বুঝি না। গোটা দেশটা তো ন্যাকায় ভরে গেল, আমি রাজনীতি বুঝি না! ওরে তোরা রাজনীতি বুঝিস না বলেই দেশটার উন্নতি হয় না"।
অঞ্জনা বলল, "আমিও তাই মনে করি। তার সঙ্গে এটাও বিশ্বাস করি, রাজনীতি জানতে হলে দেশের ইতিহাসটাকেও বুঝতে হবে"।
শুভায়ু মাথা নাড়ল, "গুড। তুই চাইলে আমাদের সঙ্গে হিঙ্গলগঞ্জে যেতে পারিস। ওখানে আমাদের ইউনিয়ন থেকে একটা মেডিকেল ক্যাম্প অরগানাইজ করা হবে গরীব মানুষের জন্য। যত বেশি মানুষের সঙ্গে থাকব আমরা, তত বেশি জানতে পারব মানুষ ঠিক কতটা অসহায় এখন। কেন, বাম শাসনের এত বছর পরেও মানুষের মধ্যে দারিদ্র আছে সেটাও বোঝা দরকার। সব কিছুর জন্যই সময় দরকার। এক দিনে বিপ্লব আসে না। একইভাবে এত বছর পরেও কেন কোন উন্নতি হবে না, সেই আত্মসমালোচনাটাও আমাদের করা দরকার। তুই কি বোর হচ্ছিস?"
হঠাৎ কথা থামিয়ে জিজ্ঞেস করল শুভায়ু।
অঞ্জনা হেসে ফেলল, "না না!"

২২।

বৃষ্টি পড়ছে। তপন বাস স্ট্যান্ডে নেমেও বাড়ি ফিরতে পারছেন না।
ভজা বাইক নিয়ে যাচ্ছিল।
বাইক দাঁড় করিয়ে বাস স্ট্যান্ডে এসে বলল, "দাদা গাড়ি নেই আপনার?"
তপন ভজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এম এল এরা কত মাইনে পায়? সে টাকায় গাড়ি কিনবে কোত্থেকে?"
ভজা দাঁত বের করে বলল, "না মানে দাদা অনেককেই তো দেখি। ভি আই পি মানুষ আপনি। এরকম বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখতে কেমন লাগছে"।
তপন বললেন, "ও অভ্যাস আছে"।
ভজা বলল, "দাদা আমি নেতাজী সঙ্ঘের সেক্রেটারি। চেনেন বোধ হয়। আগের বার ছাব্বিশে জানুয়ারী ফুটবল টুর্নামেন্ট হল, আপনি এসেছিলেন"।
তপন বললেন, "হ্যাঁ, তোমার মুখ চিনি তো। দেখেওছি রাস্তা ঘাটে"।
ভজা বলল, "দাদা, কনস্টেবলের পরীক্ষা দিয়েছিলাম, টাকা চাইছে"।
তপন ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "টাকা চাইছে? কে চেয়েছে? কত টাকা?"
ভজা বলল, "না দাদা, মানে আপনি তো জানেন, টাকা পয়সা ছাড়া এই লাইনে ঢোকা কত চাপ"।
তপন বললেন, "না না, আমি সেটা বলছি না। আমি জানতে চাইছি, কে তোমার কাছে টাকা চেয়েছে সেটা আমাকে জানাও। আমি যা ব্যবস্থা নেওয়ার, নিয়ে নেব"।
ভজা মাথা চুলকে বলল, "আমি জেনে আপনাকে বলি দাদা?"
তপন বললেন, "জানো না? না জেনেই একটা ফেক অভিযোগ করে ফেললে?"
ভজা বলল, "অভিযোগটা ফেক না দাদা, কে চেয়েছে, সেটা আমি জানি না। আমার পাড়ার এক দাদা আছে, আমি তো তার নামটা আপনার কাছে বলতে পারব না। সে ভদ্রলোক আমার কাছে শুধু খবর এনে দিয়েছিলেন"।
তপন বললেন, "ঠিক আছে, তোমার যদি যোগ্যতা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই পাবে। আমাকে অ্যাডমিট কার্ডের নাম্বারটা দিয়ে যেও"।
বৃষ্টিটা ধরে এসেছিল। ভজা বলল, "চলুন দাদা, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসি"।
তপন বললেন, "নাহ, আমি হেঁটে যেতে পারব। হাঁটার দরকার আছে"।
তপন হাঁটতে শুরু করলেন।
তপনকে হাটতে দেখে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে ভজা তপনের পিছন পিছন হাঁটতে থাকল। তপন বললেন, "বাইকটা রেখে এলে?"
ভজা বলল, "আপনাকে ছেড়ে আসি ভাবলাম। একা একা হাঁটছেন"।
তপন হাসলেন, "তুমি কি আমাকে সিকিউরিটি দেবে? আমার সিকিউরিটি লাগে না। যাও"।
ভজা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে গেল।
বাড়ি এসে তপনের মনে পড়ল কাজের তাড়াহুড়োয় দুপুরে খেতে ভুলে গেছেন। শ্যামলী টিভি দেখছিলেন। তপন বললেন, "ভাবলাম অ্যাসেম্বলিতে ক্যান্টিনে খেয়ে নেব, ভুলেই গেছি। কিছু আছে?"
শ্যামলী বললেন, "রুটি খাবে, আলুভাজা দিয়ে?"

তপন বললেন, “ধুস! সারাদিন ধরে রান্না করে যাচ্ছো। বাদ দাও, ফ্রিজে তরকারি থাকলে গরম করে দাও”।
শ্যামলী একটা প্লেটে একবাটি ভাত আর তরকারি নিয়ে এসে দিলেন।
তপন সেটা খেতে খেতে বললেন, “বাবান হিঙ্গলগঞ্জ যাচ্ছে, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি একদিকে টেনশনেও থাকছি। আরেকদিকে মনে হচ্ছে ভালোই হচ্ছে। দেশের নিচু স্তরে না পৌঁছলে ও কী করে বুঝবে মানুষ ঠিক কত কষ্টে আছে? আমাদের জেনারেশন যে কষ্টে বড় হয়েছে, বাবানদের জেনারেশন সে কষ্টের সিকিভাগও দেখে নি। মানুষ ফাঁপরে না পড়লে বামপন্থার প্রয়োজনীয়তা বোঝে না। ভারতবর্ষ উন্নয়নশীল দেশ। একটার পর একটা শপিং মল খোলা শুরু হল। এরা তো অভাব কী জিনিস তাই জানে না!”
শ্যামলী বললেন, “তুমি মন থেকে চাও, বাবানদের জেনারেশন অভাবের মুখোমুখি হোক?”
তপন বললেন, “তা কেন চাইব? কিন্তু কলকাতায় বসে থাকলে আমাদের যুব সমাজ কী করে বুঝবে দেশে কী চলছে? এদের তো গ্রামে যেতে হবে। গোঁড়াটাই যদি আমাদের কাটা থাকে, তাহলে আমরা বুঝব কী করে আমাদের এই ভাতটা যারা জোগান দিচ্ছে, তাদের আসলে কতটা কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কৃষি ঋণ বুঝতে হবে তো! কেন চাষীরা কৃষিঋণ মেটাতে না পেরে সুইসাইড করে, গ্রামের মানুষরা ঠিক কী কষ্টের মধ্যে দিয়ে যায়, সেটা আমরা না বুঝলে আর কারা বুঝবে?”
টিভির স্ক্রিণটা কাঁপতে কাঁপতে বন্ধ হয়ে গেল।
তপন হতাশ গলায় বললেন, “গেল বোধ হয়। এবার একটা টিভি না কিনলেই নয়”।
শ্যামলী বললেন, “তোমার কাছে অত টাকা আছে?”
তপন বললেন, “ইনস্টলমেন্টে নিতে হবে। আর কী?”
শ্যামলী বললেন, “ছাড়ো। টাকা না থাকলে কিনতে হবে না”।
তপন বললেন, “না, তুমি ভেবো না। ও ব্যবস্থা হয়ে যাবে”।
শ্যামলী বললেন, “কীভাবে ব্যবস্থা হবে?”
তপন বললেন, “বললাম তো হয়ে যাবে”।
শ্যামলী বললেন, “না হলে বেশি চিন্তা করবে না। ও দেখা যাবে”।
তপন আর কিছু বললেন না। ঘরে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল।

২৩।

গ্রামের মানুষেরা লাইন দিয়েছেন স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। কিছুক্ষণ সব কিছু দেখে শুভায়ুর হঠাৎ ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। সে সরে এসে সিগারেট ধরাল। অঞ্জনা তার কাছে এসে বলল, "কী হল দাদা? ওদিকটা গেলে না?"

শুভায়ু বলল, "এত বছর ধরে বামপন্থীরা ক্ষমতায়, অথচ আমরা এসব জায়গার আরো উন্নতি করতে পারতাম না? মানুষ এত কষ্টে থাকবে? আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে"।

অঞ্জনা বলল, "আগের জেনারেশন পারে নি। নেক্সট জেনারেশন করবে হয়ত। হয়ত তোমাদের জেনারেশনই করবে"।

শুভায়ু হতাশ গলায় সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "আমি যা ভেবেছিলাম, পরিস্থিতি তার থেকে অনেক বেশি খারাপ। রাস্তাঘাট ঠিক নেই, মানুষের থাকা ঠিক নেই, এমনভাবে এ মানুষেরা বেঁচে আছে, যেন এখানে জন্ম নেওয়াটাই তাদের পাপ হয়ে গেছে"।

অঞ্জনা বলল, "ঠিক আছে, মন খারাপ কোর না। অন্য কথা বলি?"

শুভায়ু বলল, "কী বলবি?"

অঞ্জনা বলল, "তুমি বরং একবার আমাদের ওদিকে যেও শীতের সময়। আমাদের গ্রাম তোমার খুব ভাল লাগবে"।

শুভায়ু বলল, "বেশ। যাব। তোদের ওদিকে ট্রাক্টরের ব্যবহার হয়?"

অঞ্জনা বলল, "হ্যাঁ, হয় তো। তবে আমাদের ওদিকটা কিন্তু বাংলাদেশ বর্ডার"।

শুভায়ু বলল, "আমার কত ইচ্ছা একবার বাংলাদেশ যাব। যদি কখনো চাকরি পাই, সবার আগে বাংলাদেশ যাব। ঠাকুরদার বাড়িটা দেখে আসব অন্তত একবার"।

দূর থেকে একটা বড় নৌকো আসতে দেখা গেল।

শুভায়ু অবাক হয়ে বলল, "এখানে আবার কে এল?"

কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকো ঘাটে দাঁড়াল। নৌকা থেকে প্রত্যুষ নামলেন। শুভায়ু খুশি হয়ে বলল, "তুমি চলে এলে?"

প্রত্যুষ শুভায়ুর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "সারপ্রাইজড হয়েছিস কেমন বল? তোর বাবা যা চিন্তা করছিল তোকে নিয়ে, আমি ভাবলাম, আমিও ঘুরেই যাই। সাংঘাতিক কাজ করেছিস তো ভাইপো? এখানে চলে এলি?"

শুভায়ু বলল, "এসেছি সেটা তো দেখতেই পারছো, কিন্তু আমি ভাবতেই পারছি না, এসব জায়গার অবস্থা এখনো এত খারাপ কেন?"

প্রত্যুষ বললেন, "প্রান্তিক জায়গা একটা কারণ বটে। তবে শুধু সে যুক্তিতে তুই সন্তুষ্ট হবি না, সেটা আমার থেকে ভাল আর কে জানে? তার থেকে মেনে নিই, হ্যাঁ, আমরা এখানে প্রায় কিছুই করি নি। অনেক বেশি নজর দেওয়া উচিত ছিল। আমি যতটা পারি চেষ্টা করব এদিকটা এবার নজর দেওয়ার। যাই হোক, আমি এলামই যখন, ক্যাম্পটা ঘুরে আসি"।

প্রত্যুষের সঙ্গে দুজন নিরাপত্তারক্ষী ছিল। তারাও প্রত্যুষের সঙ্গে রওনা দিলেন। অঞ্জনা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

প্রত্যুষ চলে গেলে অঞ্জনা বলল, "ওঁকে টিভিতে দেখি। তুমি এদের সবাইকে চেনো?"

শুভায়ু বলল, “বাবার যারা বন্ধু বান্ধব, তাদেরই চিনি। এর বাইরে সেভাবে খুব বেশি কাউকে চিনি না। কেন বলত?”
অঞ্জনা বলল, “এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। তোমার বাবার এরকম সিকিউরিটি গার্ড আছেন?”
শুভায়ু হেসে ফেলল, “ক্ষেপেছিস? আমরা খাওয়াতে পারব নাকি? খুব মাপজোকের সংসার। লোকে ভাবে এম এল এ মানেই প্রচুর পয়সা। আমার ভাগ্য ভাল, আমার বাবা ইজ অ্যান অনেস্ট পার্সন, অ্যান্ড আই অ্যাম এ প্রাউড সন”। অঞ্জনা বলল, “তুমি তোমার খরচা কী করে চালাও?”
শুভায়ু বলল, “টিউশনি করি। আমার খরচা বলতে তো সিগারেটের খরচ। সেরকম টানাটানি হলে সিগারেট ছেড়ে দেব”।
অঞ্জনা বলল, “আমি তোমাকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিতে চাইলে নেবে?”
শুভায়ু বলল, “কেন সিগারেট কেন কিনে দিবি? তাছাড়া আমার বাবা আমাকে বার বার শিখিয়ে দিয়েছে, কারো কাছ থেকে কিছু নেওয়া মানে আগে বুঝে নিতে হবে সে কোন কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য জিনিসটা দিচ্ছে নাকি। যদি সেটা হয়, তাহলে সে জিনিস কিছুতেই নেওয়া যাবে না। দেখ, আমার কাছে তোকে দেওয়ার মত সেরকম কিছুই নেই। তাই যদি সেই আশা করে থাকিস, তাহলে সে গুড়ে বালি”।
অঞ্জনা বলল, “আমি এমনি দিতে চেয়েছি। অত কিছু ভেবে দিতে চাইনি বিশ্বাস কর”।
শুভায়ু বলল, “আচ্ছা, চাপ নেই। বিশ্বাস করলাম। জানিস, আমার বাবার যখন খুব মুড ভাল থাকে, তখন ছাদে গিয়ে আমি আর বাবা কাউন্টার টানি। বাবা কত গল্প বলে! একটা সময় ছিল যখন কংগ্রেসী পুলিশ বাবাকে মেরে ফেলবে বলে ঠিক করেছিল। হাউ থ্রিলিং”!
অঞ্জনা বলল, “তারপরে?”
শুভায়ু বলল, “বাবা খিদিরপুরে লুকিয়েছিল অনেক দিন। সেখান থেকে বাবার মেজোকাকা আন্দামানে থাকত, ওখানে চলে গেছিল। কী সব গল্প। আমার বিশ্বাসই হয় না। বাবা বলে বিশ্বাস না করলে কিছু করার নেই। এ সবই ঘটেছিল!”
প্রত্যুষ ফিরছিলেন। শুভায়ুকে বললেন, “তুই আমার সঙ্গে চল বাবান। তোর বাবা চিন্তা করবে। আমাকে ফোন করবে। তার থেকে চল”।
শুভায়ু বলল, “ধুস, তা হয় নাকি? আমি ওদের সঙ্গে এসেছি, ওদের সঙ্গেই ফিরব। তুমি বরং বাবাকে জানিয়ে দিও, তার ছেলে দিব্যি কাজ করছে”।
প্রত্যুষ হেসে বললেন, “সে তো আমি জানতাম তুই যাবি না। ঠিক আছে, সাবধানে ফিরবি। আর কোন সমস্যা হলেই আমাকে বা তোর বাবাকে ফোন করবি। রাত করবি না”।
শুভায়ু ঘাড় নাড়ল।
প্রত্যুষ নৌকায় উঠে রওনা দিলেন।
অঞ্জনা বললেন, “উনি আপনাকে খুব ভালবাসেন? খোঁজ নিচ্ছিলেন খুব?”
শুভায়ু বলল, “হ্যাঁ, প্রত্যুষকাকু অনেক দিন থেকেই আমাদের বাড়ি আসেন। শুধু আজকাল বাবা প্রত্যুষকাকুর উপর একটু বিরক্ত...” শুভায়ু চুপ করে গেল।
অঞ্জনা বুঝল এ বিষয় নিয়ে শুভায়ু আর কিছু না বললেই খুশি হবে। সে চুপ করে গেল।
সারাদিন প্রচুর মানুষকে ভিটামিন ট্যাবলেট, ফল, প্রয়োজনমত ওষুধ ইত্যাদি দেওয়া হল।
সন্ধ্যেয় নৌকো করে ফেরার সময় শুভায়ু যখন গান ধরল, তখন সে আর লক্ষ্য করল না অঞ্জনার চোখ দুটো তাকে যেন মাতালের মত দেখছে...

২৪।

শুভায়ুর ফিরতে রাত বারোটা বাজল। দেখল বাড়ির বাইরে বাবা দাঁড়িয়ে আছে। শুভায়ু বলল, “তুমি জেগে আছো?”
তপন হাসলেন, “তোর যখন ছেলে হবে, তখন বুঝবি কেন জেগে আছি। এখন বুঝবি না”।
শুভায়ু ঘরে ঢুকে জুতো ছাড়তে ছাড়তে বলল, “আমার ওসব হবে না। আমি ঠিক করেছি পাস আউটের পর আমি হোল টাইমার হব। শহরে না, গ্রামে। আমরা এত বছর ধরে ক্ষমতায় আছি, অথচ যেমন খারাপ অবস্থা রাস্তা ঘাটের, তেমন খারাপ অবস্থা মানুষের। কেন বাবা?”
তপন বললেন, “কারণ আমরা একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় সরকার চালাই। পশ্চিমবঙ্গ কোন আলাদা রাষ্ট্র নয়। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পর্যাপ্ত টাকা দেয় না। আমাদের সরকারী কর্মীদের মাইনে দিয়ে যে টাকা আসে, সে টাকা পর্যাপ্ত নয়”।
শুভায়ু বলল, “তাহলে মাইনে দিও না”।
তপন বললেন, “দুভাবে সরকার চালানো যায়। এক তুই যেভাবে বললি, আর দুই সেই টাকাটা কমিয়ে দিয়ে আরো বেশি টাকা রাস্তা তৈরীতে ঢালতে হবে। এবার ঘটনা হল মানুষের হাতে টাকার প্রয়োজন আছে। এখন তো বিনিময় প্রথা চলছে না। এখনও আমাদের টাকার দরকার আছে। আবার কর্মসংস্থানের দরকারটাও আছে। অনেকটা সে কারণেই নতুন কারখানা গড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। কারখানা যখন হবে, তখন সেই কারখানাকে ঘিরে অসংখ্য শিল্প গড়ে উঠতে পারে। রাস্তাঘাটের উন্নতি তো হবেই, একইসঙ্গে অসংখ্য মানুষ সেল্ফ সাফিসিয়েন্ট হবে। চাষীর ছেলে চাষীই হবে, এটা মহাজনেরা সবসময় চেয়ে এসেছেন।”
শুভায়ু বলল, “সেটা তো একটা দিক গেল বাবা। কিন্তু তুমি যেটা বলছ, তাতে চাষীর ছেলের চাষী থেকে শ্রমিকে ট্রান্সফরমেশন হবে”।
তপন হাসলেন, “ না, তা হবে না। তার জন্য আমরা আরো বেশি করে স্কুলের দিকে জোর দেব। স্কুল ছুটের পরিমাণ আমাদের আমলে অনেক কমেছে। খোঁজ নিয়ে দেখবি সত্তর সালের আগে স্কুল টিচারদের মাইনে কত ছিল। আমরা এই সকলের জন্য বিনা খরচে শিক্ষা চাই, যাতে চাষীর ছেলে পড়াশুনা করে তার মত করে জীবিকা ঠিক করে নিতে পারে। সে চাইলে তার কৃষি ব্যবস্থাকেও আরো উন্নত করতে পারে, কিংবা ওই কারখানায় একজন উচ্চপদস্থ অফিসার হিসেবে নিয়োজিত হয়ে একটা জেনারেশনকে এক ধাপ এগোতে পারে। সকলের জন্য শিক্ষা ইজ মাস্ট। শিক্ষা শুধু নয়, সুশিক্ষা। শিক্ষার যত বিকাশ হবে, মানুষ তত স্বনির্ভর হবে। শুধুমাত্র ভাল পড়াশুনাই একটা মানুষের উচ্চতাকে অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে”।
শুভায়ু বলল, “তাহলে ইংরেজি তুলে দেওয়া হয়েছিল কেন?”
শ্যামলী খেতে দিলেন। সবাই মিলে খেতে বসল।
তপন রুটি খেতে খেতে বললেন, “প্রাথমিকে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ভাবা হয়েছিল একটা এক্সট্রা ভাষার চাপ বাচ্চারা হয়ত নিতে পারবে না। তবে আমার মতে এই সিদ্ধান্তের দুটো দিক আছে। অনেক দেশই ইংরেজি ছাড়াও ভালই চলছে। তুই চীনকেই দেখ”।
শুভায়ু বলল, “ বাহ, এই তুমি বললে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর কথা, আর এই বললে চীনকে দেখতে? দেশের সব রাজ্যে তো ইংরেজি তোলা হয় নি! শুধু এই রাজ্যে তোলা হল কেন?”
তপন কয়েক সেকেন্ড শুভায়ুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন, “ধরেছিস ঠিক। ভুল হয়েছিল। একইসঙ্গে কম্পিউটারের বিরোধিতাটাও। কিন্তু এই ভুল স্বীকারটা আমরা করি। তুই বল না, তুই তো পড়াশুনা

করেছিস। ফিজিক্সের কত ল আছে প্রথমে ভুল বেরিয়েছিল। আরেকজন বিজ্ঞানী সেটাকে ভিত্তি করে এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন বলেই তো আগের ভুলটা যে ভুল সেটা জানা গেল। ভুল মানুষ মাত্রেই হয়। কমিউনিস্টরা যন্ত্রমানব নয়। কিন্তু বাকি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমাদের একটা বেসিক পার্থক্য আছে। বাকিরা ভুল স্বীকার করবে না। আমরা করব। এই যেমন ক্ষমতায় থাকা মানেই আমাদের চারপাশে অনেক ধান্দাবাজ মানুষ ঘোরাফেরা করবে। তারা আমাদের বিপথে চালাবার চেষ্টা করবে। আমরাও তো মানুষ। আদর্শভ্রষ্ট হতে কতক্ষণ? তাই ঘুষের আমদানী হয়েছে নিচুস্তরের কর্মীদের মধ্যে। আমাদের সময় ক্লাস নেওয়া হত। এখন সেসব কোথায়? আবার কিছু লোক আছে নাক উঁচু। আমি কমিউনিস্ট মানেই বিরাট কিছু করে ফেলেছি টাইপ ব্যাপার। এই সব ধরণের মানুষই পার্টির জন্য বিপজ্জনক। তুই বিশাল বসুকে প্রোজেক্ট করে দিলি, ভদ্রলোক সারা জীবন কমিউনে কাটিয়ে দিলেন,নিজের জামা কাপড় নিজে কাচলেন, একটু বেশি বকবক করলেন কিন্তু লোকটা ভারি ভাল, আর তাকে প্রোজেক্ট করে লোকাল কাউন্সিলর পার্টির হয়ে ঘুষ নেবে, তা তো হতে পারে না। হতে পারে কি?”

তপনের খাওয়া হয়ে গেছিল। উঠে হাত ধুতে ধুতে বললেন, “কমিউনিজম অত সোজা জিনিস না। এখন কয়েকজনের জন্য সেটা বড্ড খেলো হয়ে গেছে। ভাল লাগে না আজকাল”।

তপনের গলা বিমর্ষ শোনাল।

২৫।

সকালে উঠে তপন বাইরের ঘরে গিয়ে দেখলেন বেশ কয়েকজন এসে বসে আছে। গৌর একটু উত্তেজিত। তপন গৌরের দিকে তাকালেন, "কী হয়েছে?"
গৌর বলল, "নেতাজী সঙ্ঘের দিকে একটা পুকুর বোজানো চলছে। তুমি জানতে?"
তপন বললেন, "না তো। চ' দেখি"।
গৌরের বাইক আছে। সেটায় করে এলাকায় গিয়ে দেখলেন মাটি ভর্তি দুটো ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। সেদিনের ভজা বলে ছেলেটাও দাঁড়িয়ে। তপনকে দেখে ভজা দাঁত বের করে এগিয়ে এল, "আরে দাদা, আপনি?"
তপন বললেন, "কী হচ্ছে এখানে? পারমিশন আছে?"
ভজা বলল, "ফ্ল্যাট হবে দাদা। ক্লাবেরই পুকুর। মিউনিসিপালিটির পারমিশন আছে। খুব বড় বিল্ডার"।
তপন বললেন, " মিউনিসিপালিটির পারমিশন আছে? দেখি"।
ভজা পকেট থেকে কাগজ খোঁজার ভান করে পেল না। ফোন বের করে বলল, "আমি কথা বলিয়ে দিচ্ছি। বড় সাংবাদিক, দিলীপবাবু। কথা বলুন। ওরই আত্মীয় মিউনিসিপালিটির সাথে কথা বলে প্রোজেক্টটা করছে।"
তপন বললেন, "বেশ তো। কথা বলাও"।
ভজা ফোন করল কাকে একটা। ফোনটা তপনের দিকে এগিয়ে দিল। ও প্রান্ত থেকে দিলীপ সান্যালের গলা ভেসে এল, "হ্যাঁ তপনবাবু। আগেই জানিয়ে দি, পারমিশন আছে"।
তপন বললেন, "কাগজ দেখাতে হবে। তাছাড়া আমার কন্সটিটুয়েন্সিতে পুকুর বুজিয়ে বে আইনি ভাবে ফ্ল্যাট আমি তুলতে দেব না"।
দিলীপ বললেন, "আপনি কিন্তু গায়ের জোর দেখাচ্ছেন। প্রেসের লোকের সাথে এভাবে কথা বলবেন তা বলে? আচ্ছা বাদ দিন, কত নেবেন বলুন। একটা ফ্লোর আপনাকে দিতেই পারি আমরা"।
তপন রাগলেন না, হাসি হাসি মুখে বললেন, " ব্যাং বলে কত জল? তোর সাহস দেখে অবাক হলাম। শোন, তোকে একটা কথা আমি দিলাম এখন, এই এলাকায় পুকুর বোজানো কেন, এক ঝুড়ি মাটিও পুকুরে ফেললে তার কপালে দুঃখ আছে"।
ফোনটা ভজার হাত দিয়ে তপন চেচিয়ে উঠলেন, " কাজ বন্ধ"।
ভজা বলল, "প্লিজ দাদা, আমাদের চাকরি নেই, এভাবেই রুটি আসবে, প্লিজ দাদা এটা করবেন না"।
তপন গৌরকে বললেন, "থানায় ফোন কর। ওসিকে আসতে বল"।
গৌর ফোন করতে চলে গেল। তপন ভজাকে বললেন, "এটা পদ্ধতি না। পরিবেশের ক্ষতি করে, বে আইনি কনস্ট্রাকশান করে কখনো মানুষের ভাল হতে পারে না। তোমার কাজ দরকার বলে কি তুমি চুরি ছিনতাই করতে পারবে? সেটা যেমন পারবে না, একইভাবে বে আইনি কন্সট্রাকশনও করতে পারো না। বুঝাতে পেরেছি?"
ভজা আর কিছু বলল না। থমথমে মুখে দূরে সরে গেল। এলাকার লোক জড়ো হতে শুরু করেছে। তারাও তপনের সঙ্গে একমত। কেউই কিছু জানত না। ক্লাব থেকে মাটি ফেলা শুরু হয়েছিল।
তপন বললেন, "কত সাহস, আমাকে ঘুষ দিতে যাচ্ছে। ভাব জাস্ট"।
গৌর ইয়ার্কি মেরে বলল, "ভাল তো, নিতে পারতে, টিভিটা হয়ে যেত"।
তপন বললেন, "ওই টাকায় টিভি দেখলে আমার চোখ দিয়ে রক্ত বেরোত রে। আর তোর বউদি ওই টিভি ঘরে ঢুকাতে দিত ভেবেছিস?"

গৌর হাসতে হাসতে বলল, “ক্ষেপে যাচ্ছো কেন?”
মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান রজত এলেন। তাদেরই দলের। তপনকে শ্রদ্ধা করেন। তপন বললেন, “কী ব্যাপার রজত, এই এলাকার কনস্ট্রাকশান এপ্রুভ হল কী করে?”
রজত চোখ কপালে তুলে বলল, “কে এপ্রুভ করেছে দাদা? আমি তো করি নি। কাগজ দেখিয়েছে ওরা কিছু?”
তপন ভজার দিকে তাকালেন। ভজা বাইক স্টার্ট করে বেরিয়ে গেল। তপন বললেন, “গোটা ব্যাপারটাই আমাদের অজান্তে ক্লাব করাচ্ছিল। এদের শো কজ নোটিশ পাঠাও। আর পুকুরটা কী করে ক্লাবের হল সেটা দেখো”।
ওসি এলেন কিছুক্ষণ পরে। তপন বললেন, “এই ক্লাবের সেক্রেটারি দাঁড়িয়ে থেকে পুকুর ভরাট করাচ্ছিল। বেকার ছেলে, কাজ বাজ নেই, এরেস্ট করতে হবে না। তবে ঝাড়বেন অবশ্যই। আর লক্ষ্য করবেন এই অঞ্চলে যেন আর মাটি ভরাট না হয়”।
ওসি বললেন, “ঠিক আছে স্যার। আমি দেখে নেব”।
তপন রজতকে বললেন, “এই জমির কাগজটা দেখো তো। এসব এলাকায় মেনে নেওয়া যাবে না। এরা জানেই না একটা পুকুর বোজানো মানে কী কী ক্ষতি হতে পারে। এভাবেই পরিবেশটা শেষ হয়ে যাচ্ছে”।
রজত মাথা নাড়লেন, “আমি দেখে নিচ্ছি”।

২৬।

বিধানসভা পৌঁছতেই প্রত্যুষ ধরলেন তপনকে, “আরে তোর জন্যই বসেছিলাম। এখন হাউজে ঢুকতে হবে না। কথা আছে, আয়”।

একটা অফিস রুম ফাঁকা ছিল। প্রত্যুষ তপনকে নিয়ে সে ঘরে ঢুকলেন। তপন অবাক হলেন, বললেন “কী হল তোর?”

প্রত্যুষ গলা নামিয়ে বললেন, “তুই এস জি কনস্ট্রাকশানের কাজ আটকেছিস?”

তপন বললেন, “সেটা আবার কী?”

প্রত্যুষ বললেন, “খুব বড় কোম্পানি। রাজারহাটে বেশ কয়েকটা প্রোজেক্ট করছে। তোর ওখানে একটা করছিল, তুই নাকি আটকে দিয়েছিস। ভদ্রলোক আমাকে ফোন করেছিলেন”।

তপন বললেন, “ পুকুর বুজিয়ে যেটা?”

প্রত্যুষ মুখটা কুঁচকে বললেন, “পুকুর বোজাতে হলে বোজাতে হবে। তাছাড়া এটা বোঝার চেষ্টা কর, সামনের বার তুই মিনিস্টার হবি। এসব লোকের সঙ্গে গুড টার্মস থাকলে তোর কোন ক্ষতি আছে কি?”

তপন বললেন, “ক্ষতি? আমাকে তুই লাভ ক্ষতি শিখাচ্ছিস? তাছাড়া আমি কি একবারও বলেছি আমি মন্ত্রী হতে চাই? উইদাউট এনি পারমিশন পুকুর বুজিয়ে আমার এলাকায় কনস্ট্রাকশন করবে আর আমাকে সেটা মেনে নিতে হবে? ইমপসিবল। তুই আমাকে এটা নিয়ে কনভিন্স করাতে পারবি না”।

প্রত্যুষ বললেন, “দেখ ভাই, আমি কথা দিয়েছি ভদ্রলোককে। কাজটা করতে হবে। এখন শুদ্ধদা শিল্প আনতে চাইছেন। উনি জানলে উনিও রাগ করবেন কিন্তু”।

তপন বললেন, “জানুন উনি। আমি কথা বলব দরকার হলে। সব ঘটনা জানলে শুদ্ধদাও রাজি হবেন না, আমি খুব ভাল করে জানি। ঠিক আছে, আমিই কথা বলছি”।

প্রত্যুষ তপনের হাত ধরে টানলেন, “ ঠিক আছে, শোন শোন। বাদ দে। তুই যখন চাইছিস না, তখন হবে না। লিভ ইট”।

তপন প্রত্যুষের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ব্যাপারটা খুব আনএক্সপেক্টেড তোর কাছে। তুই আজকাল এদের হয়ে কথা বলবি, জাস্ট ভাবতে পারছি না”।

প্রত্যুষ বললেন, “পারসোনালি নিস না। আমি ওভাবে বলতে চাই নি”।

তপন বললেন, “ দেখ ভাই, আমি বিরাট কিছু পড়াশুনা জানি না বাবানের মত। কিন্তু একটা জিনিস জানি, এই ফ্ল্যাট তৈরীর নামে যেভাবে পুকুরগুলো বোজানো হচ্ছে, তাতে আমাদের কিছু না হলেও ভবিষ্যতে তোর আমার ছেলে কিংবা নাতি নাতনীদেরই ক্ষতি হবে। আর তুই কি জানিস, ওই দিলীপ সান্যাল আমাকে ঘুষ দিতে চেয়েছিল? এত সাহস পায় কোত্থেকে এরা?”

প্রত্যুষ বললেন, “আরে গলা নামিয়ে কথা বল। দিন দিন কী হচ্ছে তোর? তোর আর আমার কথা হচ্ছে। অন্য কেউ শুনলে আরেকটা ক্যাওয়াস তৈরী হবে।”

তপন বললেন, “শোন, তুই তো আমার আজকের কমরেড না। অনেক দিনের বন্ধু। তোর ফ্যামিলি বল, তুই বল, আমার একটা অধিকার আছে তোদের উপর। একইভাবে তোরও আছে আমার উপর। আমি তোকে বলব, এসব লোকের পাল্লায় পড়িস না। ক্ষতি হবে লং টার্মে। আমরা যে পার্টিটা করি, সেটার সঙ্গে আর পাঁচটা পার্টির একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। আমরাই যদি এসব ইল্লিগাল কাজের মধ্যে ঢুকে যাই, তাহলে নেক্সট জেনারেশন আমাদের মধ্যে কেন ইন্টারেস্ট পাবে বল?”

প্রত্যুষ বললেন, “ভুল করছিস। এরা সেরকম নয়। ওদের এন জিও গরীব মানুষদের জন্য অনেক কাজ করে”।
তপন হেসে ফেললেন, “এটা আমাকে বোঝাচ্ছিস না নিজেকে? ওদের এন জিও কাজ করে? এসব এন জিওর কাজ যে কী লেভেলের আই ওয়াশ তুই জানিস না? নাকি তোকে আবার সব নতুন করে বোঝানো শুরু করতে হবে?”
প্রত্যুষ হাত জোড় করলেন, “ঠিক আছে ভাই, এই নিয়ে আমি আর তোকে কিচ্ছু বলব না। তুইও এটা নিয়ে আর ঘাঁটাস না। চেপে যাস”।
তপন বললেন, “তুই বলেই চেপে গেলাম। অন্য কেউ হলে কপালে দুঃখ ছিল। আমিও বুঝি আমাদের কাছে সব ধরণের মানুষই আসে, কিন্তু তা বলে একটা ছাঁকনি রাখব না তাদের জন্য?”
প্রত্যুষ বললেন, “আচ্ছা ভাই, ঘাট হয়েছে। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে আজ তোকে আমি ক্যান্টিনে ডিমের চপ খাওয়াব, খুশি? এবার হাউজে ঢুকি চল”।
তপন বললেন, “ হু, চল”।

২৭।

“কীরে, হাউ ওয়াজ হিঙ্গলগঞ্জ? আমার তো আর যাওয়া হল না”।
কলেজ পৌঁছোতেই প্রীতম শুভায়ুকে জিজ্ঞেস করল। শুভায়ু বলল, “কাজ ভাল হয়েছে। তবে তোর যাওয়া উচিত ছিল। দেখে আসতে পারতিস দেশের কী অবস্থা “।
প্রীতম বলল, “ঠিকই। মিস করলাম। নো প্রবলেম, এর পরের বার তোর সঙ্গে যাব”।
শুভায়ু বলল, “বেশ তো, যাস”।
প্রীতম বলল, “আচ্ছা শোন না, তুই আমাকে প্রত্যুষ আংকেলের নাম্বারটা দিতে পারবি?”
শুভায়ু বলল,”কেন বল তো?”
প্রীতম চারদিকে তাকিয়ে বলল, “আর বলিস না, আমাদের বাড়ির জমিটা নিয়ে একটা ঝামেলা চলছে তোকে তো বলেছি। বাবা এমনিতেই হাই প্রেশারের রুগী। শরীরটাও খারাপ যাচ্ছে। আমি ভাবছি যদি প্রত্যুষ আংকেল কোনভাবে হেল্প করতে পারেন। আমাদের বাড়ি তো ওর কনস্টিটুয়েন্সিতেই”।
শুভায়ু বলল, “প্রত্যুষকাকু তো হিঙ্গলগঞ্জেই এসেছিলেন। সেদিন এলে মিটেই যেত। আচ্ছা দিচ্ছি”।
শুভায়ু নোটবুক বের করে প্রীতমকে নাম্বারটা দিল। প্রীতম বলল, “আমি কিন্তু তোর রেফারেন্স দেব”।
শুভায়ু বলল, “অবভিয়াসলি। বলবি তুই বাবানের বন্ধু”।
প্রীতম বলল, “বাবান? তোর ডাক নাম বুঝি?”
শুভায়ু হাসল, “ইয়েস। চ লাইব্রেরী যেতে হবে। দুটো বই তুলব। পরে ক্লাসে আসছি”।
প্রীতম বলল, “ওকে”।
লাইব্রেরী পৌঁছে শুভায়ু দেখল অঞ্জনা বই খুঁজছে। সে বলল, “কীরে, ক্লাস বাংক মারলি নাকি?”
অঞ্জনা তাকে দেখে হাসল, “না গো, অফ পিরিয়ড এখন। আমারও বই নেওয়ার ছিল”।
শুভায়ু তার বই ইস্যু করিয়ে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে দেখল তার সঙ্গে অঞ্জনাও বেরিয়েছে। সে বলল, “কাল বাবার সঙ্গে অনেক আলোচনা হল। বাবার সঙ্গে কথা বললে অনেক কিছু ক্লিয়ার হওয়া যায়। একটা ভাল ব্যাপার শুনলাম যে আমাদের স্টেট এখন ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবছে। এই যে এত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হচ্ছে, সেখান থেকে পাস আউট হয়ে স্টুডেন্টরা কোথায় যাবে? সবাইকে কেন রাজ্যের বাইরে যেতে হবে? এ ব্যাপারটা যে স্টেট গভর্নমেন্ট চিন্তা করছে, এটা গুড সাইন”।
অঞ্জনা হাসল, “তুমি খুব হোম সিক বুঝি?”
শুভায়ু বলল, “কেন, তুই না?”
অঞ্জনা বলল, “প্রথম দিকে মন খারাপ হত। এখন বেশ ভাল লাগে। কেমন একটা স্বাধীন স্বাধীন ব্যাপার”।
শুভায়ু বলল, “সেটা মনে হচ্ছে তুই এই রাজ্যে আছিস বলে। বাইরের স্টেটে গেলে সেই স্বাধীনতাই গলার ফাঁস হয়ে যাবে। শুধু তাই না, তোকে তো এস্টাব্লিশমেন্ট কস্টের দিকটাও দেখতে হবে। তুই বাইরে আছিস, আর তোর ফ্যামিলি থাকবে ওখানে। কলকাতার মত এত শস্তায় কি সেখানে খাবার বা থাকার জায়গা পাবি? তার উপরে বাড়ি আসা যাওয়ার ব্যাপার থাকবে। সেটাও একটা খরচ। নিজের স্টেটে যদি কারখানা হয়, কর্মসংস্থান হয়, তার থেকে ভাল আর কিছু হয় কি? হ্যাঁ, মানছি আমাদের অনেকটা রাস্তা পেরোতে হবে, কিন্তু এ রাজ্যে ইন্ডাস্ট্রিটা ভীষণ দরকার!”
অঞ্জনা মাথা নাড়ল, “তুমি ঠিকই বলেছো। আমি এভাবে ভেবে দেখি নি। ঠিকই তো, কর্ণাটক বা তামিলনাড়ু কত দূর, সেখানে চাকরি করতে যাওয়াটাও মস্ত বড় হ্যাপা। তার থেকে আমাদের রাজ্যে যদি কিছু হয়...

আচ্ছা শুভায়ুদা, তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে?”
অঞ্জনা হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে এই প্রশ্নটা করে বসায় শুভায়ু হকচকিয়ে গিয়ে বলল,”মানে?”
অঞ্জনা লজ্জা পেয়ে গেল, “না মানে হঠাৎ মাথায় এল। না ধর, হয়ত তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে বলেই হয়ত তুমি স্টেট ছাড়তে চাও না। সেটা একটা মস্ত বড় কারণ হতে পারে।”
শুভায়ু হেসে ফেলল, “দূর পাগল, সেটার জন্য গার্লফ্রেন্ড থাকার দরকার আছে নাকি? বাবা মাই এনাফ। এই যে ওরা আমাকে সব সময় সাপোর্ট দেয়, সারাদিন না হলেও বাড়ি ফিরে বাবার সঙ্গে খেতে বসি, এটা একটা আলাদাই ভাল লাগা। সেটা যখন একা থাকব তখন তো পাব না। বুঝলি?”
অঞ্জনা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রীতম চলে এল। অঞ্জনা বলল, “আমি ক্লাসে যাই এবার”।
শুভায়ু বলল, “ যা”।
অঞ্জনা যেতেই প্রীতম লাফিয়ে পড়ল, “কীরে ভাই, প্রেম করছিস নাকি?”
শুভায়ু বলল, “ধুস, জুনিয়র মেয়ে। প্রেম কেন হবে? তাছাড়া ছেলে আর মেয়ে কথা বললেই প্রেম ভেবে নিস কেন? দিস ইজ ভেরি ব্যাড। তোকে বুঝতে হবে...”
শুভায়ু আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। প্রীতম হাত জোড় করল, “থাক বাপ, থাক। আর লেকচার ঝাড়িস না। চল ক্লাস করি”।
শুভায়ু কটমট করে প্রীতমের দিকে তাকিয়ে বলল, “ চল”।

২৮।

“এবার আমাদের দিকে পাল্লা বেশ ভারি। বিধানসভায় আমরা আশাতীত ভালো রেজাল্ট করব। আর যেটা শুনতে পাচ্ছি, নেক্সট ইয়ার আমরা একজন মন্ত্রী পাচ্ছি আমাদের অঞ্চল থেকে। কাল আমাদের ক্যান্ডিডেট ঘোষণা হবে আলিমুদ্দীন থেকে। আমাদের কাছে যা খবর আছে, এ বছরেও তপনই প্রার্থী হচ্ছে”।

পার্টি অফিসে মিটিং চলছে। বক্তব্য রাখছিলেন সূর্য বাগচী। তপন কিছুক্ষণ আগে এসেছেন। বললেন, “মন্ত্রী পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না সেটা বড় কথা না। আমাদের আরো জনসংযোগ বাড়াতে হবে। আমরা শিল্প চাইছি, সেটার সপক্ষে মানুষকে বোঝাতে হবে”।

তপনের কথা শেষ হল না, এক পার্টিকর্মী জানাল তপনকে কে ডাকছে। তপন বেরোলেন। দেখলেন একটা বড় গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির সামনের সিটে ভজা বসে আছে। তপন যেতে গাড়ি থেকে একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক নেমে তপনের দিকে এগিয়ে এল, “সরি টু ডিস্টার্ব ইউ দাদা। আসলে আমারই ভুল ছিল। আপনার কন্সটিটুয়েন্সিতে বিল্ডিং হবে, আর আপনি জানবেন না তা কি হয়?”

তপন বললেন, “আপনি এস জি কন্সট্রাকশান থেকে এসছেন, তাই না?”

ভদ্রলোকের গলায় মোটা সোনার হার। সেটায় মাঝে মাঝেই হাত দেওয়া ভদ্রলোকের মুদ্রাদোষ। বললেন, “দাদা, আমি বলি কি, ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন। দেখুন, ওখানে বিল্ডিংটা হলে এলাকার দু চারটে ছেলে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি পাবে। আমি বলছি, আপনি যাকে যাকে বলবেন, আমি তাদের কাজে ঢুকিয়ে দেব। আপনি আর না করবেন না প্লিজ।”

তপন ভদ্রলোকের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, “আপনি আসতে পারেন। এই ডিসিশন চেঞ্জ হবে না”।

ভদ্রলোক বললেন, “দাদা আমার অনেকটা ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গেছে। ক্লাবের ছেলেরা আমায় ভুল বুঝিয়ে জায়গাটা আমার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে, নইলে আমি ডিসপুটেটেড ল্যান্ডে কেন ইনভেস্ট করব বলুন?”

তপন বললেন, “কিছু না দেখেই অনেক টাকা ইনভেস্ট করার মানুষ তো আপনারা নন। আপনারা দেখে শুনেই ইনভেস্ট করেন। ভেবেছিলেন আমার কাছে কোন খোঁজ আসবে না, আপনি ক্লাবের মাধ্যমেই যা করার করে ফেলবেন”।

“হে হে দাদা যে কী বলেন!”

তপন বললেন, “আমি কিছুই বলি না। তবে আমার ডিসিশন কিন্তু এই ব্যাপারে চেঞ্জ হবে না”।

ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বললেন, “দিলীপদা বোধ হয় আপনাকে বলেছে একটা ফ্লোর দেবে। আমি আপনাকে পঞ্চাশ লাখ টাকা অফার করছি দাদা। ওই জমিটায় আমার অনেক টাকা ইনভেস্ট হয়ে গেছে। এখন যদি আপনি...”

তপন আকাশে চোখ তুলে বললেন, “পঞ্চাশ লাখ?”

ভদ্রলোক আশার আলো দেখলেন যেন, “আপনি বললে আর দশ দিতে পারি। তাছাড়া সামনে ইলেকশন আসছে। ব্যানার থেকে শুরু করে অনেক কিছুই লাগবে। পার্টি ফান্ডে আমি আরো দশ দিয়ে দেব না হয়?”

তপন গৌরকে ডেকে পকেট থেকে টাকা দিয়ে বললেন, “একটা ফিল্টার উইলস নিয়ে আয়”।

গৌর টাকাটা নিয়ে চলে গেল। তপন বললেন, “কংগ্রেসী আমল পার করে এসছি বুঝেছেন ভাই? হাত টাতে জোর মন্দ নেই। আপনি আমাকে এসব বলছেন, এখনো সেভাবে চেনেন নি আর কী। চুপ চাপ কেটে পড়ুন। নইলে কপালে দুঃখ আছে। সকাল থেকে আপনারা আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ে যাচ্ছেন...”

কথাটা শেষ হল না। জোরে একটা টায়ার ফাটার শব্দ হল যেন খুব কাছে। একটা বাইক জোরে বেরিয়ে গেল। তপন দেখলেন রাস্তায় গৌর পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক।

ঘটনার আকস্মিকতায় তপন থতমত খেয়ে গেছিলেন। লোকটা তপনের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলল, "আসি দাদা। ভাল থাকবেন। আশা করি ভবিষ্যতে আমার প্রোপোজালটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করবেন"।

লোক জমতে শুরু হয়েছিল। লোকটা চুপচাপ গাড়িতে উঠে বেরিয়ে গেল। তপন ভিড়ের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "আমার দিকে না তাকিয়ে এম্বুলেন্স ডাকুন। কী দেখছেন আপনারা আমার দিকে তাকিয়ে?"

পার্টি অফিস থেকে সবাই ছুটে বেরিয়ে আসছে।

তপন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

২৯।

তপন পার্টি অফিসের ভিতর গিয়ে বসেছিলেন। তার মাথা কাজ করছিল না। যে ছেলেটার সঙ্গে দু মিনিট আগেও কথা হল, সে এভাবে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে পারে কিছুতেই ভাবতে পারেন নি। তার সত্তর দশকের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।
অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হয় নি। তার আগে গৌরের নিথর দেহটা দেখে যে যা বোঝার বুঝে গেছে। পুলিশ এসেছে। তপনের সঙ্গে দেখা করে গেছে।
পার্টি অফিসের লোকজন বাজারের ভিড় সামলাচ্ছিল। তপনের সঙ্গে সূর্য এসে বসেছিন। সূর্য বললেন, "এভাবে ভরা বাজারে ব্যাপারটা হল। এটা নিয়ে বিরোধীরা কিন্তু ঝামেলা করবে"।
তপন বললেন, "বিরোধীরা কেন? ঝামেলাটা আমাদেরও করা উচিত। এইরকম কিছু ঘটতে পারে, ধারণাও করতে পারি নি"। কথাটা বলে তপনের মনে পড়ল ঘন্টাখানেক আগে গৌরই তাকে বাইকে করে পার্টি অফিসে নিয়ে এসেছে। একটা মানুষ এত সহজে চলে যেতে পারে? হাত দিয়ে দু চোখ ঢাকলেন তিনি, কেমন অসহায় লাগছে নিজেকে।
সূর্য বললেন, "গৌরের বাড়িতে খবর গেছে। তাও ভাল ছেলেটার বিয়ে হয় নি"।
তপন সূর্যর দিকে তাকালেন, "ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছিল"।
সূর্য বললেন, "ঈশ, এমন তরতাজা একটা ছেলে"।
তপন বললেন, "একটা সময় আমাদের লড়াই ছিল জমি দখলের। এখন লড়াইটা কিন্তু জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে শুরু হল। আজকে সকালে আমার সঙ্গে নেতাজী সঙ্ঘের জমিটা নিয়ে ঝামেলা হল ওদের ক্লাবের ছেলেটার সঙ্গে। রাতে ছেলেটাকে নিয়ে ওই লোকটা দেখা করতে এল। ওরা থাকাকালীন গৌরকে টার্গেট করে... ওরা আমাকেই ভয় দেখাল। এটাই বোঝাল চাইলে আমাকেও যে কোন সময় মেরে দিতে পারে"।
সূর্য বললেন, "তাহলে তোমার নিরাপত্তার জন্য পুলিশকে বল। তুমি তো সিকিউরিটি পাবে"।
তপন বললেন, "নাহ, সিকিউরিটির দরকার আমার নেই। তাহলে বার্তা যাবে আমি ভয় পেয়ে গেছি"।
সূর্য কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, শুভায়ু পার্টি অফিসে ঢুকল। তার চোখ মুখ উদভ্রান্ত। সে বলল, "কী হয়েছে বাবা"?
তপন কয়েক সেকেন্ড শুভায়ুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাড়ি যা বাবান, আমার যেতে সময় লাগবে"।
শুভায়ু বলল, "তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না। আমি তো এই বাজারে এলাম একটু আগে। এসে দেখছি... তুমি চল"।
সূর্য বললেন, "তাই ভাল তপন। তুমি যাও এখন। ছেলে ভয় পাচ্ছে"।
তপন শুভায়ুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বস"।
শুভায়ু বসল।
তপন বললেন, "তোকে বলেছিলাম না স্বার্থে ঘা লাগলে মানুষ অমানুষে পরিণত হতে পারে। গৌরের ব্যাপারটাও ঠিক তাই। ওরা আমাকে ভয় দেখাতে এসেছিল"।
শুভায়ু বলল, "কারা?"
তপন বললেন, "জমি মাফিয়ারা। এরা এলাকার পুকুর বুজিয়ে ফ্ল্যাট করবে। স্বার্থের সংঘাত হচ্ছে এখন। আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। ওরা তোকেও টার্গেট করবে। তোকে সাবধানে চলা ফেরা করতে হবে বাবান"।

শুভায়ু বলল, "আমাদের কেন সাবধানে চলা ফেরা করতে হবে? যারা এ কাজটা করেছে, ভয়টা তো তাদের করতে হবে"।
তপন কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থাকলেন। তারপর বললেন, "ঠিক বলেছিস, সূর্যদা ওসিকে আসতে বল"।
ওসি স্পটেই ছিলেন। সূর্য বাইরে বেরিয়ে ওসিকে ডেকে আনলেন। ওসি পার্টি অফিসে এলে তপন বললেন, "সকালের ব্যাপারটা। আমি ভেবেছিলাম কোন স্টেপ নেব না। কিন্তু এবার নিতে হবে। সকালের ব্যাপারে এস জি কনস্ট্রাকশানের নামে এফ আই আর করুন। আর আজকের জন্য ওর মালিক... নামটা জানি না... ওর নামেও এফ আই আর করুন। উনি আমাকে স্পষ্ট হুমকি দিয়েছেন যে আমরা জমিটা ছেড়ে না দিলে ওরা এরকম কাজ আরও করতে পারে"।
ওসি বললেন, "ঠিক আছে স্যার। আমি খোঁজ নিচ্ছি। চলুন আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আসি"।
তপন ওসির দিকে তাকিয়ে বললেন, "নাহ। আপনারা আপনাদের কাজ করুন। আমার ছেলে আছে। আমি ওর সঙ্গে ফিরব"।
ওসি বললেন, "ঠিক আছে"।
তপন উঠলেন, "চল বাবান। বাড়িতে নিশ্চয়ই মা চিন্তা করছে"।
শুভায়ু বলল, "হ্যাঁ চল"।
দুজনে বেরলেন। বাজার ভর্তি লোক গৌরের মৃতদেহ ঘিরে রয়েছে। তপন ধরা গলায় বললেন, "গৌরের এই পরিণতি আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না"।
শুভায়ু বলল, "আমি তো ভাবতেই পারছি না বাবা"।
তপন বললেন, "চাপ আসছে বুঝলি তো। এবার চাপ আসছে। ওরা পুকুর বুজিয়ে ফ্ল্যাট বাড়ি করবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ওদের কোন চিন্তাই নেই। আমি তো না হয় অত পড়াশুনা করি নি, তুই বল বাবান, এভাবে সব পুকুর ভরাট হওয়া কি ভাল লক্ষণ?"
শুভায়ু বলল, "কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু ওরা বোধ হয় এভাবেই ভয় দেখিয়ে যাবে তোমাকে"।
তপনের চোয়াল শক্ত হল, "দেখাক ভয়। আমিও ছাড়ব না এরপর। দেখি কত বাড়তে পারে ওরা"।
শুভায়ু তপনের হাত শক্ত করে ধরলেন। বাবা ছেলে ধীরে ধীরে বাড়ির পথে রওনা দিল।

৩০।

ঘুম থেকে উঠে তপন অভ্যাসবশত গৌরের ডাকের অপেক্ষা করে বুঝলেন, ছেলেটা আর নেই। রোজ সকালে গৌর এসে ডেকে দিত, "দাদা ওঠো শিগগিরি, বাইরে অনেক লোক এসে গেছে"।

নিজের অজান্তেই চোখে জল এসে গেল তপনের। উঠে দেখলেন শুভায়ুর ঘরে প্রত্যুষ বসে আছেন। শ্যামলী চা দিয়েছে। প্রত্যুষ তাকে দেখে বললেন, "উঠেছিস?"

তপন প্রত্যুষকে দেখে বললেন, "এস জির নামে এফ আই আর করতে বলেছি বলে এত দূর চলে এলি?"

প্রত্যুষ হাসার চেষ্টা করলেন, "তুই ভুল করছিস। আমি এস জির জন্য কেন আসতে যাব? তোর জন্য এসেছি। গৌরের জন্য এসেছি"।

তপন চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই মুহূর্তে বেরিয়ে যা তুই। তোর লজ্জা লাগে না? একজন কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার হয়ে তুই খুনি পুঁজিবাদীদের হয়ে কথা বলিস? আমি জানি, তুই আছিস, তুই আছিস এর মধ্যে। সত্যি করে বল"।

শুভায়ু ঘরে ঢুকে পড়েছিল। তপনের মূর্তি দেখে বাবাকে জড়িয়ে ধরতে গেল, "বাবা কী করছ?"

তপন বললেন, "তুই ওকে বেরিয়ে যেতে বল। নইলে আমি কী করব আমি নিজেই জানি না"।

শুভায়ু কাতর চোখে প্রত্যুষের দিকে তাকাল। প্রত্যুষ ইশারা করলেন তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যুষ বেরিয়ে গেলে শুভায়ু বলল, "কী দরকার ছিল বাবা? কথা বলত, চলে যেত। প্রত্যুষকাকুকে খেপিয়ে দিলে কেন খামোখা?"

তপন চুপ করে বসে পড়লেন শুভায়ুর খাটে। বললেন, "ও কালকেই আমাকে এস জি কনস্ট্রাকশানের হয়ে কথা বলেছিল। ওরা সবাই আছে এর মধ্যে"।

শুভায়ু বলল, "ঠিক আছে বাবা। বাইরেও কিন্তু অনেক লোক আছে। তুমি শান্ত হও। এত রাগ ভাল না"।

তপন বললেন, "হুঁ"।

কিছুক্ষণ পর তপন বাইরে গিয়ে বসলেন। শ্যামলী চুপ করে রুটি করছিলেন। শুভায়ু গিয়ে মার কাছে দাঁড়াল। শ্যামলী বললেন, "সৎ মানুষের ঘর করার সমস্যা হল, গর্ব যেমন হয়, ভয়টাও হয়। ওরা যদি কাল তোর বাবাকে কিছু করত বাবান"?

শুভায়ু মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "এলাকার মানুষ এবার সতর্ক হয়ে যাবে মা। আর সাহস পাবে না। চোখের সামনে হঠাৎ করে যা করেছে, ওই একবারই পেরেছে। আর পারবে না"।

শ্যামলী বললেন, "ব্যাপারটা সেরকম না। তুই সে জিনিস দেখিস নি। দু চারটে বোম ফেললে গোটা এলাকার লোক ভয় পেয়ে বাড়ি ঢুকে যাবে"।

শুভায়ু বলল, "অতই সোজা নাকি? মানুষ ছেড়ে দেবে?"

শ্যামলী বললেন, "অশান্তি লাগছে। কী যে হচ্ছে ছাই, অত কিছু বুঝিও না, কিন্তু তোর বাবাকে তো বুঝি। ভীষণ মাথা গরম মানুষ। ভোট আসছে। আজ আবার ক্যান্ডিডেট লিস্ট ঘোষণা হবে। তোর বাবাকে না দাঁড় করালে সব থেকে বেশি খুশি হব আমি"।

শুভায়ু হাসল, "তা কি আর হবে? পার্টি বাবাকে ছাড়া এ এলাকা থেকে আর কাউকে দাঁড় করাবে না। বাবা দাঁড়াবেও, আর জিতবেও"।

শ্যামলী বললেন, "তোর বাবাকে একটু বুঝাস বাবান। বয়স হচ্ছে। মাথা ঠান্ডা করে চলে যেন"।

শুভায়ু বলল, "ঠিক আছে বুজিয়ে দেব। আমি যাই, বাবা একা আছে, সার্টিফিকেট লিখতে হয় যদি"।

শ্যামলী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, “যা”।

#

সন্ধ্যেয় প্রার্থী তালিকা ঘোষিত হল। তপন রায়কে এবারেও প্রার্থী করা হয়েছে।

তপনকে ফোনে জানানো হল স্টেট কমিটি থেকে।

তপনের বার বার বারণ সত্ত্বেও একজন নিরাপত্তারক্ষী দেওয়া হবে জানালো পার্টি থেকে। তার খাওয়া দাওয়ার দায়িত্ব তার নিজেরই থাকবে। বাইরের ঘরে রাতে শোবে। সর্বক্ষণ তপনের সঙ্গে থাকবে। পার্টির নির্দেশ অমান্য করতে পারলেন না তপন।

বাইরের ঘরে পার্টির ছেলেরা এসে জড়ো হয়েছে। আলোচনা চলছে কীভাবে প্রচার শুরু হবে তা নিয়ে।

তপন সেখানে যেতেই সবাই উল্লাস করে উঠল।

তপন বললেন, “আনন্দ করার কিছু নেই। আমার কাছে এটা একটা কর্তব্য। ভোটে লড়াটাও। তোরা গৌরের মা বাবার খোঁজ নিস নিয়মিত। আমি বোধহয় কোন দিন আর ওদের মুখোমুখি হতে পারব না”।

কথাগুলো বলে তপন কেঁদে ফেললেন। মুহূর্তে বাড়ির পরিবেশ থমথমে হয়ে গেল।

৩১।

।।কয়েকদিন পরের কথা।।

ভোটের রেজাল্ট বেরিয়েছে। চারদিকে বামফ্রন্টের জয় জয়কার। তপন রায়, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে রেকর্ড ভোটে হারিয়েছেন। লাল আবিরে মাখামাখি হয়ে বাড়ি ফিরলেন যখন, তখন সন্ধ্যে হয়েছে। ভজারা অনেক চেষ্টা করেছিল তপনকে হারানোর, ক্লাব থেকে সরাসরিও নেমেছিল, কিন্তু পারে নি। উন্নততর কমিউনিস্ট সরকার এবং শিল্পের জোয়ারের সম্ভাবনায় লাল হাওয়ায় বিরোধীরা উড়ে গেছে।

তপন বাড়ি ঢুকতেই শুভায়ু বাবাকে জড়িয়ে ধরল। তপন বললেন, "ওরা কম চেষ্টা করে নি আমাদের ভয় দেখাতে। পারল না। এই জেতার তৃপ্তিটা আলাদা"।

পার্টির ছেলেরা এক হাড়ি রসগোল্লা দিয়ে গেছে। তপন কিছুতেই নিতে চান নি, তাও দিয়েছে। তপন বললেন, "তোর মাকে হাড়িটা দে। পার্টির ছেলেরা এলে ওদের দিতে হবে"।

শুভায়ু বলল, "বাবা তোমাকে একটা কথা বলব? লজ্জায় বলতে পারছিলাম না আসলে"।

তপন বললেন, "বল, লজ্জার কী হল?"

শুভায়ু বলল, "আমি টিউশনের টাকা জমিয়ে একটা মোবাইল কিনেছি। আসলে মা চিন্তা করত তো, তুমি রাগ করলে?"

তপন হাসলেন, "বেশ করেছিস। টেকনোলজি যখন সে সুযোগ দিচ্ছে, তখন নিবি না কেন? তা কবে কিনলি ফোনটা?"

শুভায়ু বলল, "টাকা জমানোই ছিল। তোমার জেতার খবর শুনে কিনে আনলাম। এই দেখো"।

শুভায়ু মোবাইলের বাক্সটা তপনকে দিল।

তপন বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। বেশ করেছিস। খুব জরুরি একটা কাজ করেছিস তুই। আমিই ভাবছিলাম তোর জন্য একটা ফোনের ব্যবস্থা করতে হবে। ভালই হল, সে টাকায় টিভিটার ব্যবস্থা হবে একটা"।

শুভায়ু বলল, "হ্যাঁ, এবার টিভিটার ব্যবস্থা কর। মা আর কত বই পড়বে?"

তপন বললেন, "সে যদি তুই বলিস বই পড়া খারাপ, সেটা কিন্তু না। তবে ওই যে বললাম, প্রযুক্তি। ভীষণ দরকারি জিনিস। খবর শোনা, দেশ বিদেশের কথা জানা, সেটাও দরকার। অবশ্য আমরা সেটা করি না। আমরা কী করি? সিরিয়াল দেখি"।

তপন হেসে উঠলেন। তার সঙ্গে শুভায়ুও হাসল।

শুভায়ু বলল, "তোমাকে নাকি মন্ত্রী করবে বাবা? খবরটা কি সত্যি?"

তপন বললেন, "জানি না। অনেকে বলেছে। ও করলেই কী আর না করলেই বা কী। মন্ত্রী হওয়া মানে কি, তোর কাজের ক্ষেত্রটা বাড়বে। তোকে জানতে হবে গোটা রাজ্যের ব্যাপারে। আমাদের মন্ত্রীরা যথেষ্ট কাজ করেছেন এ যাবৎকাল। তাদের সাধ্যের বাইরে গিয়েই করেছেন। যদি আমাকে ওদের পছন্দ হয়, হবে। আমি খুব একটা উৎসাহিত নই। আমি বরং উৎসাহিত তোদের প্রজন্মটাকে নিয়ে। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম কী চাইছে, কী ভাবছে, কী করে জাতিগতভাবে আমরা আরো সামনের দিকে এগোতে পারি, আমি অনেক বেশি এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করি বাবান। তুই আর ক'মাস পরে পাস আউট করবি। তোর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। তুই তো রাজ্য ছাড়বি না"।

শুভায়ু বলল, "কিছুতেই না। যা করব, এখানে থেকে করব"।

তপন হাসলেন, “পাগল ছেলে। তাই করিস। মানুষের পাশে থাকিস। একজন সাচ্চা কমিউনিস্টের সেটাই কর্তব্য”।

শুভায়ু বলল, “প্রত্যুষ কাকুর সঙ্গে এবার মিটিয়ে নাও বাবা। সেদিন কাজটা তুমি ভাল কর নি। তাছাড়া এক পার্টির এম এল এ, পার্টির আরেকজন এম এল এর সঙ্গে কথা বলবে না, এই ব্যাপারটা আমার কেমন যেন লাগে”।

তপন বললেন, “প্রত্যুষ অনেক পাল্টে গেছে বাবান। ও এরকম ছিল না। আমি তো ওর বিরুদ্ধে কিছু বলি নি পার্টিতে। কিন্তু একজন কমিউনিস্ট নেতা যদি পুঁজির দালালি শুরু করে, তাহলে সে আর কমিউনিস্ট থাকে না। আমি প্রত্যুষকে কমিউনিস্ট বলে ভাবি না”।

শুভায়ু বলল, “তাহলে শুদ্ধবাবু যে কারখানা করবেন, সেটাও পুঁজির দালালি?”

তপন বললেন, “যদি সেই কারখানা থেকে শুদ্ধবাবুর ব্যক্তিগত লাভ হত, তাহলে আমি সেটাকে পুঁজির দালালিই বলতাম। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। উনি তোদের মত ছাত্রদের কথা ভেবেছেন, আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যতের কথা ভেবেছেন। ঠিকই তো, তুই ভাব না, চাকরি কোথায়? তাও বছর বছর স্কুল সার্ভিস কমিশনটা হচ্ছে বলে রক্ষা। কিন্তু তাতে ইঞ্জিনিয়ারদের কী লাভ হবে? সেক্টর ফাইভে কিছু আইটি কোম্পানি ছাড়া আমাদের রাজ্যে স্ট্রং ইন্ডাস্ট্রি এক হলদিয়া ছাড়া কোথাও নেই। পুঁজির দালালি, আর কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা- এ দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। দুটোকে গুলিয়ে ফেলিস না। আর আমাকে প্রত্যুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যাপারেও জোর করিস না। তোকে ও স্নেহ করত এককালে, এখন করে নাকি জানি না। যদি ও কথা বলে, তুই বাজে ব্যবহার করিস না। কিন্তু ওই টুকুই। এর বাইরে আর কিছু না”।

শুভায়ু ঘাড় নাড়ল, “আচ্ছা, তাই হোক”।

৩২।

ইউনিভারসিটি পৌছতেই প্রীতম বলল, "ভাই খাওয়া"।
শুভায়ু অবাক গলায় বলল, "কেন? মানে কী আনন্দে?"
প্রীতম বলল, "আংকেল জিতেছেন, এই আনন্দে"।
ইউনিয়নের আর পাঁচ জন ছেলে মেয়ে ছিল। ওরাও শুভায়ুকে ঘিরে দাবী জানাতে শুরু করল।
শুভায়ু বলল, "ওকে ওকে। ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে ধার দিতে হবে ভাইলোগ। টাকার বড়ই অভাব"।
প্রীতম বলল, "সে দেওয়া যাবে"।
শুভায়ু বলল, "ঠিক আছে। ক্যান্টিনে খাইয়ে দেব তাহলে"।
প্রীতম জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "ক্যান্টিনে না। আমার ফ্ল্যাটে। ক্যান্টিনের খাবার খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে ভাই। এই তো পাঁচ জন আছি। চল। আজ ক্লাস বাংক হোক"।
সবাই লাফিয়ে উঠল, "হোক হোক"।
শুভায়ু বলল, "বাবা জানলে যা রাগ করবে না! একে তো এই ভিক্ট্রি সেলিব্রেশন একবারেই মেনে নিতে পারে না। তার ওপর যদি শোনে ক্লাস বাংক করে এইসব করেছি, আমার খবর আছে"।
প্রীতম শুভায়ুর কাঁধে হাত রেখে বলল, "সব কাজ কি আমরা বাড়িতে বলে করি ভাই? চল প্লিজ আজ একটু মজা করি"।
শুভায়ু বলল, "বেশ, চল"।
তারা বেরোতে যাবে। অঞ্জনার মুখোমুখি হয়ে গেল একসঙ্গে। প্রীতম বলল, "এই অঞ্জনা, শুভায়ু আমাদের ট্রিট দেবে। চল চল। তুই না গেলে সে ট্রিটটাই তো ইনকমপ্লিট হয়ে যাবে"।
অঞ্জনা লজ্জা পেল। শুভায়ু প্রীতমের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকাল। তবে শুভায়ুর আপত্তি ধোপে টিকল না।
গলফ গ্রীনে প্রীতম একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকে। ফ্ল্যাটে যাওয়ার আগে প্রীতম বলল, "আমিই মাংস রান্না করব। কিনে নিচ্ছি। ফিস্ট হোক"।
সৃজা শুভায়ুর কানে কানে বলল, "অঞ্জনাকে কলেজের প্রথমদিন তোকে প্রপোজ করতে পাঠানোটা মাস্টার স্ট্রোক ছিল বল?"
শুভায়ু রেগে গেল, "তোরা যেটা মিন করছিস, ব্যাপারটা একেবারেই কিন্তু সেসব না। এসব করিস না। মেয়েটা বাচ্চা, ঘাবড়ে যাবে। তাছাড়া আমি হোল টাইমার হতে চাই। বিয়ে টিয়ে আমার দ্বারা হবে না"।
সৃজা বলল, "বেশ তো, লিভ টুগেদার করবি"।
শুভায়ু সৃজার মাথায় চাটি মারল, "ভাগ"।
প্রীতমের ফ্ল্যাটে পোঁছে টিভি চালানো হল। সবাই মিলে রান্না করা হল। প্রীতম কোত্থেকে বিয়ারের বোতল বের করে বলল, "যারা যারা টানবি। নিয়ে নে"।
শুভায়ু রেগে গেল, "এসব কী?"
প্রীতম বলল, "আরে ভাই, তুই খাবি না ঠিক আছে। যারা খেতে চায়, খাক না"।
দেখা গেল অঞ্জনা আর শুভায়ু ছাড়া সবাই খেয়ে নিল।
গান চালিয়ে নাচতে শুরু করল সব। অঞ্জনা সিঁটিয়ে বসে রইল এক কোণে। শুভায়ু বলল, "ভয় পাস না। এরা সব এক একটা পাগল। তুই এক কাজ করিস, খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাস"।

অঞ্জনা বলল, “ভয় না, এরা যা করছে, আমার ভয় লাগছে উল্টে না পড়ে। ভয় পাচ্ছি না”।
কোল্ড ড্রিংক্স ছিল। শুভায়ু একটা গ্লাসে কোল্ড ড্রিংক্স দিল অঞ্জনাকে। সবাই “ও হো হো” করে উঠল। অঞ্জনা লজ্জা পেল।
শুভায়ু বলল, “তোদের একটা টাকাও দেব না এসব করলে কিন্তু”।
সবাই একসঙ্গে ঠোঁটে আঙুল দিল। পরক্ষণেই নাচতে শুরু করল।
বিয়ারের একটা বোতল পড়ে ছিল। প্রীতম বলল, “ভাই কিছু মনে করিস না। তোরা না খেলে গৃহস্থের অকল্যাণ। এক চুমুক করে খেয়ে নে”।
শুভায়ু বলল, “ভাট। কী সব ভুলভাল বকছিস। নেশা হয়ে গেছে তোর। বাবা জানলে ভীষণ রাগ করবে। এসব করিস না”।
প্রীতম শুভায়ুর পা ধরে ফেলল। শুভায়ু একবারেই প্রস্তুত ছিল না সেটার জন্য। বলল, “এই ভাগ ভাগ”।
প্রীতম বলল, “ভাই প্লিজ। আমাদের বন্ধুত্বের দিব্যি। প্লিজ এক ঢোক”।
শুভায়ু বলল, “ঠিক আছে। দে। এক্কেবারে কম। জাস্ট টেস্ট করব”।
প্রীতম একটা গ্লাসে বিয়ার ঢেলে শুভায়ুকে দিল। অঞ্জনার কোল্ড ড্রিংক্সের বোতল খালি হয়ে গেছিল। সেটায় বিয়ার ঢেলে দিল। বলল, “এবার সবাই আমরা একসঙ্গে খাব। চিয়ারস”।
শুভায়ু খেতে চাইছিল না। প্রীতম তাকে জোর করে গিলিয়ে দিল।
খাওয়ার পরেও প্রবল অস্বস্তি হল তার। দু চোখে রাজ্যের ঘুম নেমে এল।
কখন যে সে সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, বুঝতে পারে নি।
ঘুম ভাঙল যখন, সন্ধ্যে নেমেছে। শুভায়ু দেখল ফ্ল্যাট ফাঁকা। মেঝেতে অঞ্জনা শুয়ে আছে।
অঞ্জনার গায়ে ওড়না নেই। ঘর ময় বোতল। বিয়ারের গন্ধ। সে উঠে বাইরের দরজা খুলতে গিয়ে দেখল দরজা বন্ধ। কল থেকে জল নিয়ে এসে অঞ্জনার চোখে মুখে ছেটালয়ে অঞ্জনা উঠে বসল।
শুভায়ু বলল, “কী রে? সবাই কোথায়? দরজাও তো বন্ধ”।
অঞ্জনা কথা বলতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল কেউ তার মুখ আটকে দিয়েছে। শুভায়ু আরো জল ছিটিয়ে দিল অঞ্জনার মুখে। অঞ্জনা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করল।
শুভায়ু বলল, “কী রে? কী হচ্ছে তোর?” তার ফোনটাও খুঁজে পেল না শুভায়ু।
হঠাৎ বাইরের দরজাটা খুলে গেল।
শুভায়ু দেখল একগাদা লোক, সঙ্গে প্রত্যুষকাকু। তার পাশে প্রীতম দাঁড়ানো। সে অবাক হয়ে বলল, “কীরে? কী ব্যাপার? কী হয়েছে?”
একটার পর একটা ফটো তুলে যাচ্ছে তাদের কেউ...
#
শুভায়ু যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত এগারোটা।
তপন আর শ্যামলী চুপ করে বসে আছেন।
তাকে দেখে তপন বিহ্বল চোখে তাকালেন।
কয়েক সেকেন্ড পর বলল, “এস জি কনস্ট্রাকশনের কাজটায় এন ও সি দিয়ে দিলাম বাবান। নইলে ওরা মেয়েটার সঙ্গে তোর ছবি কালকের কাগজে ছাপাত”।
শুভায়ু বাবার দিকে দেখল।
মেঝেতে বসে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল।
তপন ভাঙা গলায় বললেন, “আজ আমি হেরে গেলাম। পুঁজির কাছে হেরে গেলাম। ওরা তোর বিরুদ্ধে রেপ চার্জ আনত নইলে। আমি জানি তুই এই কাজ করতে পারিস না। তুই ট্র্যাপড হয়েছিলি। ছেলেকেই বেছে নিলাম শেষ পর্যন্ত। আমার আর কিছু করার ছিল না। প্রত্যুষ বলল এতে নাকি কিছুই হয় না। কত বে আইনি

কনস্ট্রাকশন এন ও সি পেয়ে যায় তো নেতাজী সংঘ আর কী দোষ করল? কিন্তু কী বল তো বাবান, আমি আর আগের মত রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারব না”।

শুভায়ু তপনের পা ধরে বলল, “ক্ষমা করে দাও বাবা। আমি বুঝি নি, বিশ্বাস কর। কিছুতেই বুঝি নি”।

তপন মেঝেতে বসে শুভায়ুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, “তোকে আর এখানে থাকতে হবে না। চলে যাস এ রাজ্য ছেড়ে। যেখানে পারিস যাস। এই পার্টিও করতে হবে না, কোন মানুষের জন্য কিচ্ছু করতে হবে না। এ রাজ্য তোকে ডিজার্ভ করে না বাবান। পাস আউট করে চলে যাস এ রাজ্য ছেড়ে। যেখানে খুশি। যাস...”।

বাড়ির বাইরের দড়িতে ঝোলানো তপনের লাল আবীর মাখানো গতকালের জামাটা নীরব সাক্ষী থেকে গেল গোটা ঘটনাটার।

কিছুদিন পর মন্ত্রীসভার তালিকা বেরোল। তপন রায় নেই সে তালিকায়। তার পরিবর্তে প্রত্যুষ সাঁতরার নাম জ্বলজ্বল করছে...

৩৩।

।। ফ্ল্যাশব্যাকের পরে।।

বিকেল হয়েছে। বাইরে থেকে বাচ্চাদের খেলার শব্দ ভেসে আসছে।

অঞ্জনা সোনালীর দিকে তাকিয়ে বলল, “তারপর থেকে শুভায়ুদা রোবটের মত কলেজে আসত আর যেত। কারও সঙ্গে কোন কথা বলত না। কতবার কথা বলতে গেছি। তাকায়ও নি। পাস আউট হতেই বাইরে চলে গেল। সে রাতের কথা আমি এখনো ভুলি নি জানো! ওই লোকগুলো যেন চোখ দিয়েই আমার শরীরটা ছিঁড়ে খাচ্ছে, আর শুভায়ুদাকে প্রত্যুষবাবু বলে যাচ্ছেন, তোর থেকে এটা এক্সপেক্ট করি নি বাবান। শুভায়ুদা বিহ্বল চোখে চারদিকে দেখে যাচ্ছে। বুঝতেই পারছে না কী হচ্ছে”।

অঞ্জনার দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সোনালী বলল, “তারপর বিয়ে করে নিলে?”

অঞ্জনা বলল, “বাবার কাছে একের পর এক উড়ো ফোন আসত। বাবা ভয় পেয়েই আমার বিয়ে দিয়ে দিল। কিন্তু বাবা বোঝে নি, আমার শ্বশুরবাড়িতেও উড়ো ফোন আসতে পারে। ফলত বিয়েটা নাম মাত্রই থেকে গেল”।

সোনালী চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। অঞ্জনা নীরবে কেঁদে যেতে লাগল। সোনালী অঞ্জনার কাঁধে হাত রেখে বলল, “তুমি পরিস্থিতির শিকার। অকারণ অপরাধবোধে ভুগো না”।

অঞ্জনা বলল, “আমি যদি একবারও বুঝতাম ওরা আমাকে জড়িয়ে এভাবে শুভায়ুদাকে ফাঁসাবে, আমি কোনদিন ওই ফ্ল্যাটে যেতাম না। শুভায়ুদার নিজেরই বন্ধুরা প্রত্যুষবাবুর কথায় এভাবে শুভায়ুদাকে”...

অঞ্জনা মুখ ঢাকল দু হাত দিয়ে।

সোনালী বলল, “তপনবাবুর সঙ্গে তোমার এর পরে কোন দিন দেখা হয়েছে?”

অঞ্জনা বলল, “কোন মুখে দেখা করতাম?”

সোনালী মাথা নাড়ল। আর কিছু বলতে পারল না।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে সোনালী বলল, “চল, বেরনো যাক, তোমাকে বিরাটী মোড়ে নামিয়ে দিয়ে আমাকে তো ফিরতে হবে। আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে আমার। চল”।

মাসী শুয়ে ছিল। সোনালী মাসীর গালে চুমু খেয়ে বলল, “আসি”।

চন্দনামাসী বলল, “একদিন এসে সারাদিন থাকিস মা। থাকবি তো?”

সোনালী বলল, “থাকব”।

মাসী অঞ্জনাকে বলল, “ও মেয়ে, তুমিও এসো কেমন?”

অঞ্জনা অন্য দিকে তাকাল। তার আবার কান্না পাচ্ছিল, বহু কষ্টে সে কান্না আটকাল। জীবনটা খুব কঠিন। কাঁদতে চাইলেও চোখ মুখ শক্ত করে গোটা পৃথিবীর কাছে ভাল থাকার অভিনয় করে যেতে হয়।

তারা বেরোল। খানিকটা হেঁটে ট্যাক্সি পেল দুজনে। বিরাটীতে অঞ্জনাকে নামিয়ে সোনালী তপন রায়ের বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল।

কলিং বেল বাজাতে তপন দরজা খুললেন। তাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, “তুমি, এই সময়ে?”

সোনালী বলল, “কিছু কথা ছিল”।

তপন দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন।

সোনালী বারান্দার ঘরে বসল।

তপন তার সামনে বসে বললেন, "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো নিয়ে বসেছিলাম অনেক দিন পর। এখন তো অখন্ড অবসর। পড়াশুনাটা খুব দরকার বুঝলে? বল কী বলবে?"
সোনালী বলল, "অনেক স্বপ্ন নিয়ে চাকরি করতে এসেছিলাম। এই দু দিন আগেও ঠিক করেছিলাম ঠিক আছে, আমার নামে একটা ভুল ভাল রিপোর্ট বেরিয়েছে তো কী হয়েছে, আমি আপোষ করে নেব। ক্যারিয়র তো... করে নেব আপোষ"।
তপন চশমাটা খুলে বললেন, "সেটাই আমাদের সবার ভবিতব্য। আপোষ আপোষ আপোষ চাই, আপোষ করেই বাঁচতে চাই। তাই না?"
সোনালী বলল, "সেটাই এ জাতির ভবিষ্যৎ বোধ হয়। কিন্তু আমার দ্বারা সেটা হবে না। আমি রেজিগনেশন দেব। অন্যায়ের সঙ্গে কোন আপোষ আমি করব না। আমি প্রেস ক্লাবে দিলীপবাবুর নামে অভিযোগ জানাবো এবং আপনার পার্টিতেও চিঠি লিখব ওই রিপোর্টটা আমি করি নি"।
তপন বললেন, "কেন এই মত পরিবর্তন, তা কি জানতে পারি?"
সোনালী বলল, "যদি বলি একজন ছেলেকে ফাঁদে ফেলে তার বাবাকে দিয়ে অনৈতিক কাজ করার প্রতিশোধটা আমি এভাবেই নিতে চাই, আপনি বিশ্বাস করবেন?"
তপন সোনালীর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, "তুমি জানতে পেরেছো?"
সোনালী বলল, "কী আশ্চর্য না? যে ইজমের গল্প বলে কিছু মানুষ ভোট নিয়ে গেল, সেই প্রত্যুষ সাঁতরার মত মানুষজন কী সহজে জামা পাল্টে ফেলল। আর আপনারা এক্সপেল হয়ে গেলেন। আপনি কমিউনিস্ট, যুগ ইত্যাদি মানেন না জানি, তবু বলি, ঘোর কলি বোধ হয় একেই বলে"।
শ্যামলী চা নিয়ে প্রবেশ করলেন। সোনালী বলল, "অঞ্জনা শুভায়ুদাকে এখনো ভালবাসে। ওর বরের সঙ্গে ও প্রায় সেপারেশনেই আছে। শুভায়ুদা কি একটা মেয়ের দায়িত্ব নিতে পারবেন না?"
শ্যামলী কেঁপে উঠলেন। সোনালী শ্যামলীর থেকে চায়ের ট্রেটা নিয়ে টেবিলে রেখে শ্যামলীকে চেয়ারে বসাল। সোনালী বলল, "আমি এখন অঞ্জনার সঙ্গেই দেখা করে আসছি। আমি সব জানতে পেরেছি, সব। শুভায়ুদা দিল্লিতে একা আছেন?"
শ্যামলী তপনের দিকে তাকালেন।
তপন বললেন, "অঞ্জনা মেয়েটির ফোন নাম্বার দিও। দোষটা আমারই। সে দিনের পরে আমি নিজেকে আয়নায় দেখে ঠিক চিনতে পারি না জানো তো। ভীষণ অস্বস্তি হয়। বাবানের মত ছেলের দরকার ছিল এ রাজ্যের। ছেলেটা একা একা কী করে, কী খায়..."
তপন আর কিছু বলতে পারলেন না। তার গলা ধরে এসেছিল।
শ্যামলী এতক্ষণ পর নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, "যে লোকটা তার পার্টির জন্য জীবনের সব কিছু দিয়ে দিল, সে লোকটার কি এরকমভাবে পার্টি থেকে নির্বাসন প্রাপ্য ছিল? যে ছেলেটা তার বন্ধুদের চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে গেল, তারা তাকে কত বড় ফাঁদে ফেলে চলে গেল। মানুষ এত খারাপ কী করে হয়, আমাকে বলতে পারবে?"
সোনালী উত্তর দিতে পারল না। চুপ করে রইল।
।।২০১৩।।
ভবতারিণী ডুবেছে। সোনালী মুম্বইতে এক নিউজ চ্যানেলে চাকরি পেয়েছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে কী মনে হতে সে "সকালের খবর" এর অফিসের ঠিকানা দিয়ে বলল, "আগে এখানে যাব, তারপর এয়ারপোর্ট"।
অফিস ছন্নছাড়া। বাইরে একগাদা পোস্টার।
সোনালী অফিসে ঢুকে সরাসরি দিলীপের ঘরে ঢুকে বলল, "কেমন আছেন?"
দিলীপ তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওহ তুমি? কেমন আছো"?

সোনালী বলল, "দারুণ আছি। আমি আজ কলকাতা ছাড়ছি। ছাড়ার আগে খুব মনে হচ্ছিল সেই লোকটাকে দেখে যাই, যে লোকটা আমার মত অসংখ্য ছেলেমেয়ের রাজ্য ছাড়ার কারণগুলোর একটা"।

দিলীপ মরা মাছের চোখে সোনালীর দিকে তাকালেন।

সোনালী বলল, "আপনার জন্য একটা উপহার আছে দিলীপদা। কত কিছু শিখেছি আপনার থেকে। উপহারটা না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না। আমি যাওয়ার পর খুলবেন, কেমন?"

দিলীপ কৌতূহলী চোখে সোনালীর দিকে তাকালেন। সোনালী ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করে দিলীপের টেবিলে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

একটা সাদা খাম।

দিলীপ সান্যাল খামটা খুলে দেখলেন একটা সাদা কাগজ মুড়ে রাখা। কাগজটা খুলে দেখলেন সেটার উপরে বড় বড় করে লেখা

"থুঃ!!!"